الطريق إلى الفقه

এসো ফিক্হ শিখি

بسم الله الرحمن الرحيم

الطريق إلى الفقه

এসো ফিক্‌হ শিখি

আবু তাহের মিছবাহ

শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য

মাদরাসাতুল মাদীনাহ

প্রকাশনায়

দারুল কলম

আশ্‌রাফাবাদ (কুমিল্লাপাড়া), কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১

ফোন : ৭৩২ ০২২০

প্রকাশক–

দারুল কলম

আশ্‌রাফাবাদ (কুমিল্লাপাড়া), কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১

ফোন ঃ ৭৩২ ০২২০

(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

মাদানী নেছাব প্রকাশনা – ৭

প্রথম প্রকাশ–

শাওয়াল, ১৪২৪ হিজরী

ডিসেম্বর, ২০০৩ ঈসাঈ

প্রচ্ছদঃ বশির মিছবাহ

অক্ষর বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা

হাসান মিছবাহ

কম্পিউটার কম্পোজ–

দারুল কলম কম্পিউটার

আশ্‌রাফাবাদ (কুমিল্লাপাড়া), কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১

ফোন ঃ ৭৩২ ০২২০

মুদ্রণে ঃ মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস

৪৯, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা- ১২১১

ফোন ঃ ৮৬২২৩১৩

হাদিয়া ঃ ৬০/০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার তিন মেয়েকে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করে।

আহ্‌কাম ও মাসায়েলের উপর আমল করে তারা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে।

মাটির উপরে, মাটির নীচে এবং 'আসমানে'— সবখানে তারা যেন শান্তিতে ও প্রশান্তিতে থাকে।

আমাদের কথা

আলহামদু লিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ, দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর 'মাদানী নেছাব'-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কিতাব الطريق إلى الفقه (এসো ফিক্‌হ শিখি) আজ আত্মপ্রকাশ করছে।

দয়াময়ের দয়ার কত বিচিত্র প্রকাশ! যার পাওয়ার কথা সে তো পায়; যার না পাওয়ার কথা সে আরো বেশী করে পায়! তিনি দান করেন, কেননা তিনি উত্তম দাতা, আর তুমি পাও, কেননা তুমি অধম বান্দা। উত্তম বলেই তিনি দিয়ে যাবেন, আর অধম বলেই তুমি পাবে, পেতে থাকবে, মৃত্যু পর্যন্ত এবং মৃত্যুর পর অনন্তকাল, যদি শোকর আদায় করো। সুতরাং যে দেহসত্তাকে তিনি 'সুন্দর আকৃতিতে' সৃষ্টি করেছেন, তাঁর 'কুদরতি কদমে' তা আমি সিজদাবনত করি এবং যে হৃদয় ও আত্মাকে তিনি আপন তাজাল্লী দান করেছেন তার গভীর থেকে তাঁর শোকর আদায় করি। শোকর আলহামদু লিল্লাহ।

মাদানী নেছাবের অন্যতম মূলনীতি হলো, প্রত্যেক 'ফন' ও শাস্ত্রের প্রথম পাঠ মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রদান করা। সেজন্য ইলমুল ফিক্‌হর প্রথম পাঠরূপে الطريق إلى الفقه (এসো ফিক্‌হ শিখি) লিখিত হয়েছে। এটি প্রথম খণ্ড, এতে عبادات অংশ এসেছে। ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় খণ্ডে معاملات অংশ আসবে। যেহেতু এটি ফিক্‌হর প্রথম পাঠ সেহেতু এখানে বিষয়বস্তুর পূর্ণাঙ্গতা উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য হলো বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা অর্জন।

ইলমুল ফিক্‌হর গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং প্রয়োজন ও অনিবার্যতা আমরা সবাই জানি এবং মানি। কেননা ইলমুল ফিক্‌হ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর জীবনবিধান, যার উৎস হলো 'সুন্নাহ ও কোরআন'। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্ম ও আচরণ ইলমুল ফিক্‌হ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং ইলমুল ফিক্‌হর সাধারণ জ্ঞান ছাড়া – না ইবাদত, না মু'আমালাত – কোন কিছুই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি মোতাবেক পালন করা সম্ভব নয়। তদ্রূপ ইলমুল ফিক্‌হর সুগভীর জ্ঞান ছাড়া উম্মাহর ইমামাত ও হিদায়াত এবং রাহবারি ও পথনির্দেশের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

সম্ভবত এ কারণেই আমাদের দরসে নেযামীতে ফিক্‌হ বিষয়ে সর্বাধিক পাঠ্য-কিতাবের সমাবেশ দেখা যায়। তা'লীমুল ইসলাম (উর্দূ) ও মালাবুদ্দা (ফারসী) দিয়ে যার শুরু এবং চার খণ্ডের বিশাল হিদায়া দ্বারা যার 'আপাত' সমাপ্তি। তারপর রয়েছে 'তাখাস্‌সুস' বা উচ্চতর ফিক্‌হ অধ্যয়ন। এতসবের পরো দুঃখজনক সত্য এই যে, 'আল্লাহর ইচ্ছায়' আমরা যারা বাংলায় কথা বলি, আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় ফিক্‌হর প্রথম পাঠ গ্রহণের আয়োজন এখনো আমরা করে উঠতে পারি নি। ফলে তারা অনেক কষ্ট করে ফিক্‌হর পাঠ হয়ত গ্রহণ করে, কিন্তু ফিক্‌হর 'প্রাণ' গ্রহণ করতে পারে না। الطريق إلى الفقه (এসো ফিক্‌হ শিখি)

কিতাবটি যদি আমাদের কওমী মাদারেসের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং ঐতিহ্যপূর্ণ নেছাবের এ অনিচ্ছাকৃত অভাবটুকু মোটামুটি পূরণ করতে পারে, আর মেহেরবান আল্লাহ অধম বান্দার প্রতি তাঁর দয়া ও দান অব্যাহত রাখেন তাহলেই উদ্দেশ্য সার্থক বলে মনে করবো।

জীবন চলে যাবে, আমল থেমে যাবে, কিন্তু ইলমের খেদমত থেকে যাবে। যুগ যুগ ধরে এ ক্ষুদ্র মেহনতকে আল্লাহ যেন বাঁচিয়ে রাখেন এবং ছাদাকায়ে জারিয়া রূপে কবুল করেন। আমীন।

বইটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা। যেহেতু এটি ফিক্‌হর প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম পাঠরূপে রচিত, সেহেতু সম্মানিত আসাতিযা কেরাম দেখতে পাবেন যে; আলোচ্য গ্রন্থে–

১ – শিক্ষার্থীদের বয়সের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা সযত্নে পরিহার করেছি, যা তারা পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

২ – মাসআলার ভাষা ও উপস্থাপনা সহজ সরল ও সাবলীল রাখার চেষ্টা করেছি, যাতে প্রথম পরিচয়ের পর্বটি মসৃণ ও কষ্টহীন হয়।

৩ – আধুনিক সময়ের প্রয়োজনীয় কিছু কিছু মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে, যাতে আধুনিক ফিক্‌হর সঙ্গে শুরু থেকেই তাদের ন্যূনতম একটি জানাশোনা গড়ে ওঠে।

৪ – প্রতিটি বিষয়ের শেষে অনুশীলনের জন্য বেশ কিছু ছোট ও বড় প্রশ্ন দেয়া হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট মাসআলাগুলো শিক্ষার্থীদের উত্তমরূপে আত্মস্থ হয়ে যায়। যে কোন ফনের প্রথম পাঠের জন্য 'প্রশ্নমালা' অংশটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

৫ – বিভিন্ন হাশিয়ায় সংশ্লিষ্ট মাসআলার আরবী ফিকহী ইবারতগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে, যাতে মেধাবী ও উৎসাহী শিক্ষার্থীরা ফিক্‌হর মূল ভাষা ও বর্ণনার সঙ্গে এখান থেকেই অন্তরঙ্গতা অর্জন করতে পারে।

যদি যথাযথভাবে বইটির পাঠদান ও পাঠগ্রহণ সম্পন্ন হয় তাহলে আশা করি যে, ইলমুল ফিক্‌হ অধ্যয়নের দুর্গম পথে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সফরের অন্তত 'শুরুটি' আনন্দপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় হবে। বাকী আল্লাহর ইচ্ছা; তিনি দিলে কে বাধা দেবে! আর তিনি না দিলে কে আছে, যে দিতে পারে! আমরা শুধু তাঁর রহমতের দুয়ারে 'দস্তক' দিতে পারি, আর বলতে পারি, মাওলা! আমি এসেছি! দুয়ারে তোমার হাত পেতেছি!!

আবু তাহের মিছবাহ
শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য
মাদরাসাতুল মাদীনাহ, ঢাকা–১৩১০

সূচীপত্র

ফিক্‌হ কী ও কেন ? // ১

তাহারাত অধ্যায় // ৫

০ কোন্ পানির কী হুকুম/৫-৯ ০ سؤر এর বিধান/৯ ০ কুয়ার পানির আহকাম/১১-১২ ০ ইস্‌তিন্‌জা করার আদাব/১৩ ০ নাজাসাতের প্রকার/১৪-১৭ ০ অযুর বিধান/১৮-২১ ০ তায়াম্মুমের আহকাম/২২-২৫ ০ মোযার উপর মাসেহ/ ২৬-২৭ ০ পট্টি বা প্লাস্টারের উপর মাসেহ/২৮

নামায অধ্যায় // ২৯

নামাযের বিধান // ২৯-৫৩ ০ জামাতের বিবরণ/৫৪-৫৭ ০ ইমামতের আহকাম/৫৭-৬৩ ০ যানবাহনের নামায ৬৩ ০ জলযানের নামায/৬৪ ০ ট্রেনে ও বিমানে নামায/৬৪ ০বিতিরের নামায/ ৬৬ ০ সুন্নাত নামায/৬৯ ০ তারাবীহ/৭১ ০ জুমু'আর নামায/৭২ ০ দুই ঈদের নামায/৭৪-৭৪ ০ সফরের নামায/৭৮-৮২ ০ অসুস্থতার নামায ৮৩ ০ কাযা নামায পড়া ৮৫ ০ সাহূর সিজদা / ৮৯-৯৪ ০ তিলাওয়াতি সিজদা/৯৪-৯৭ ০ ছালাতুল খাওফ/৯৮ ০ কুসূফের নামায/৯৯ ০ ইস্‌তিস্‌কার নামায/১০০

আযান ও ইকামাত // ১০৩

জানাযা ও তার নামায

০ মৃত্যুশয্যায় করণীয়/১০৫ ০ গোসলের আহকাম/১০৬ ০ কাফন/১০৮ জানাযার নামায/১১০ দাফনের আহকাম/১১৩ ০ শহীদের আহকাম/১১৫

যাকাত অধ্যায় // ১১৮

০ স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত/১২৪ ০ দ্রব্যসামগ্রীর যাকাত / ১২৬ ০ دين বা পাওনা মালের যাকাত / ১২৮ ০ مال الضمار -এর যাকাত/১৩০ ০ যাকাতের হকদার/১৩১ ০ ছাদাকাতুল ফিতর/১৩৪

সিয়াম অধ্যায় // ১৩৭-১৪১

০ চাঁদ দেখা/১৪২ ০ يوم الشك বা সন্দেহের দিনের মাসআলা/১৪৪ ০ কখন রোযা ভঙ্গ হয় না/১৪৬ ০ রোযার কাফফারা/১৪৬ ০ যা মাকরূহ এবং যা মাকরূহ নয়/১৫০ ০ রোযাভঙ্গের ওযরসমূহ/১৫১ ০ ই'তিকাফের আহকাম/১৫৩

হজ্জ অধ্যায় // ১৫৭ ০ ওমরা/১৭২ ০ নবীজীর যিয়ারত/১৭৯

কোরবানীর বয়ান // ১৮১

ফিক্‌হ কী ও কেন ?

আল্লাহ আমাদের খালিক ও মালিক। আমরা মুসলিম, ইসলাম আমাদের দ্বীন ও শারী'আত। দ্বীন ও শারী'আত মানে আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের জন্য প্রেরিত জীবন-বিধান।

আল্লাহর বান্দা হিসাবে আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর আনুগত্য করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। আল্লাহর আদেশে যে সকল আমলের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করি শারী'আতের পরিভাষায় সেগুলোকে عبادات বলে। ইবাদাত কয়েক প্রকার, যথা– ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্ব।

আবার আমরা সমাজ-জীবনে বাস করি। মানুষ হিসাবে মানুষের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন লেনদেন হয়; বিভিন্ন রকম সম্পর্ক হয়। যেমন– বেচা-কেনা, বিবাহ-তালাক ও মামলা-বিচার। শারী'আতের পরিভাষায় এগুলোকে معاملات বলে।

عبادات ও معاملات এর জন্য ইসলামী শারী'আতের রয়েছে পূর্ণাঙ্গ আহকাম ও বিধান। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে عبادات ও معاملات সম্পর্কে শারী'আতের পূর্ণাঙ্গ আহকাম ও বিধান জানা যায় সে শাস্ত্রকে علم الفقه (বা ফিক্‌হ শাস্ত্র) বলে।

শারী'আতের যাবতীয় আহকাম ও বিধানের উৎস চারটি। কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তি হলো কোরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং বলা যায় যে, কোরআন ও সুন্নাহ-ই হলো শারী'আতের আহকাম ও বিধানের মূল উৎস।

যে কোন হুকুম ও বিধানের পিছনে উপরোক্ত চারটি উৎসের কোন একটির সমর্থন অবশ্যই থাকতে হবে। এছাড়া কোন হুকুম ও বিধান শারী'আতে গ্রহণযোগ্য নয়।

শারী'আতের চার উৎস থেকে আহকাম ও বিধান আহরণ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ যাকে কোরআন ও সুন্নাহর সুগভীর ইলম ও প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং ইলমের নূর ও অন্তর্জ্ঞান দান করেছেন তার পক্ষেই শুধু কোরআন ও সুন্নাহ থেকে আহকাম ও বিধান আহরণ করা সম্ভব। তিনি হলেন মুজতাহিদ। চারজন প্রসিদ্ধ মুজতাহিদের নাম এই–

ইমাম আবু হানীফা (রহ), ইমাম মালিক (রহ), ইমাম শাফেয়ী (রহ) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ)।

একজন ইমাম কোরআন ও সুন্নাহ থেকে যত আহকাম ও বিধান আহরণ করেছেন সেগুলোকে মাযহাব বলে। এভাবে চার ইমামের চার মাযহাব। যারা মুজতাহিদ নয়, আল্লাহ যাদেরকে ইজতিহাদের যোগ্যতা দান করেন নি তাদের কর্তব্য হলো ইমামের মাযহাব অনুসরণের মাধ্যমে শারী'আতের উপর আমল করা। তারা হলো মুকাল্লিদ। আমরা ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর মাযহাব অনুসরণ করি। আমরা ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর মুকাল্লিদ। তিনি সবার বড় ইমাম। তাই তাঁকে বলা হয় আল-ইমামুল আ'যাম। তবে চার ইমামকেই আমরা হকপন্থী মনে করি এবং সবাইকে সমান শ্রদ্ধা করি।

একজন মুজতাহিদ কোন হুকুম ও বিধান প্রথমে কোরআনে তালাশ করেন। যদি সেখানে পেয়ে যান তাহলে তা গ্রহণ করেন। কোরআনে খুঁজে না পেলে সুন্নাহ্-এ তালাশ করেন। যদি সেখানে পেয়ে যান তাহলে তা গ্রহণ করেন। যদি সুন্নাহ-এ খুঁজে না পান তাহলে তিনি তালাশ করেন যে, ছাহাবা কেরাম এ বিষয়ে সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন কি না। যদি ছাহাবা কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তাহলে তিনি সেটা গ্রহণ করেন। ছাহাবা কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে إجماع বলে। পরবর্তী যুগের ওলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকেও إجماع বলে।

কোন হুকুম ও বিধান যদি কোরআন ও সুন্নায় না পাওয়া যায় এবং এ সম্পর্কে إجماع না পাওয়া যায় তখন মুজতাহিদ নিজে কোরআন, সুন্নাহ বা ইজমা-এর আলোকে চিন্তা-ভাবনা করেন এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুজতাহিদের এই ইজতিহাদ ও চিন্তা-ভাবনাকেই কিয়াস বলে।

একজন মুজতাহিদ কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থেকে

আহকাম ও বিধান আহরণের ক্ষেত্রে কতগুলো নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেন। আহকাম ও বিধান আহরণের সেই নিয়ম-নীতিকে أصول الفقه বা ফিক্‌হর মূলনীতিমালা বলে।

বড় হয়ে এ বিষয়ে তোমরা আরো বিস্তারিত জানতে পারবে এবং আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে। এখন শুধু এটুকু মনে রাখো।

তোমরা এখন যে কিতাব পড়বে তাতে শুধু শারী'আতের আহকাম ও বিধান আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর উৎস বা প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় নি। পরে বড় বড় কিতাবে তোমরা প্রতিটি আহকামের উৎস বা প্রমাণ সম্পর্কে জানতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

মূল কথা

১ – যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে শারী'আতের আহকাম ও বিধান জানা যায় সে শাস্ত্রকে علم الفقه বা ফিক্‌হ শাস্ত্র বলে।

২ – শারী'আতের যাবতীয় আহকাম ও বিধানের উৎস চারটি। যথা– কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।

৩ – শারী'আতের চার উৎস থেকে আহকাম ও বিধান আহরণ করার যোগ্য ব্যক্তিকে মুজতাহিদ বলে। আর যাদের ইজতিহাদের যোগ্যতা নেই তাদেরকে মুকাল্লিদ বলে। মুকাল্লিদের কর্তব্য হলো মুজতাহিদের মাযহাব অনুসরণ করা।

৪ – ছাহাবা কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে إجماع বলে। পরবর্তী যুগের ওলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকেও ইজমা বলে।

৫ – কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমা-এর আলোকে মুজতাহিদ নিজে চিন্তা-ভাবনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেটাকে قياس বলে।

প্রশ্নমালা

১ – عبادات কাকে বলে? এবং معاملات কাকে বলে?

২ – علم الفقه কাকে বলে?

৩ – শারী'আতের আহকাম ও বিধানের উৎস কয়টি ও কী কী?

৪ – শারী'আতের দৃষ্টিতে আহকাম ও বিধান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত কী?

৫ – আহকাম ও বিধান কে আহরণ করতে পারেন এবং তাঁকে কী বলে?

৬ – মুজতাহিদ কাকে বলে এবং মুকাল্লিদ কাকে বলে?

৭ – চার ইমামের নাম কী কী? এবং আমরা কোন ইমামের অনুসারী?

৮ – একজন মুজতাহিদ কী পর্যায়ক্রমে আহকাম ও বিধান আহরণ করেন, বিস্তারিত বলো।

৯ – মুজতাহিদ যে সমস্ত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে আহকাম ও বিধান আহরণ করেন সেগুলোকে কী বলে?

১০ – ইজমা কাকে বলে?

১১ – কিয়াস কাকে বলে, বিস্তারিত বলো।

তাহারাত অধ্যায়

০ طهارة হলো নামাযের শর্ত, সুতরাং তাহারাত ছাড়া নামায ছহী হতে পারে না।[১]

= طهارة এর শাব্দিক অর্থ, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা। শারী'আতের পরিভাষায় তাহারাত অর্থ نجاسة দূর করার মাধ্যমে, কিংবা حدث দূর করার মাধ্যমে পবিত্র হওয়া।[২] =

০ حدث দূর করার উপায় হলো অযু করা, কিংবা গোসল করা। আর পানি ব্যবহার করা অসম্ভব হলে 'মাটি' দ্বারা তায়াম্মুম করা। হাদাছ দূর করাকে الطهارة الحكمية বলে।

আর نجاسة দূর করার উপায় হলো পানি বা পানির গুণসম্পন্ন[৩] তরল পদার্থ ব্যবহার করা। نجاسة দূর করাকে الطهارة الحقيقية বলে।

কোন্ পানির কী হুকুম?

طهارة হাছিল করার মূল মাধ্যম হলো পানি, তাই প্রথমে আমরা পানি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

---

১ - الطهارةُ شرطُ الصلاةِ، فلا تجوز الصلاةُ إلاَّ بالطهارةِ

২ - গলিয ও নাপাক পদার্থ, যেমন পেশাব, পায়খানা, রক্ত, মদ ইত্যাদিকে نَجَاسَة বলে। আর শরীর থেকে নাপাক পদার্থ বের হওয়ার কারণে শরীরের যে গুণগত অবস্থা হয় সেটাকে حَدَث বলে।

৩ - পানির গুণ হলো ময়লা দূর করা। গোলাবজল ময়লা দূর করে, সুতরাং গোলাবজল পানির গুণসম্পন্ন। তেল ময়লা দূর করে না, বরং আরো আঠা সৃষ্টি করে, সুতরাং তেল পানির গুণসম্পন্ন নয়।

৪ - সামান্য নাজাসাত মিশ্রিত হলেই অল্প পানি আর مُطْلَق (বা অমিশ্র) থাকে না, পক্ষান্তরে পাক জিনিস সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত হলেও পানি مطلق (বা অমিশ্র) বলে গণ্য হয়। তবে মিশ্রিত পাক বস্তু পানির উপর প্রবল হলে ঐ পানি مطلق থাকে না। প্রবলতা (غَلَبَة)-এর অর্থ সামনে আসছে।

০ যে পানির স্বভাবগুণ বিদ্যমান রয়েছে এবং তা না-পাক বস্তুর মিশ্রণ থেকে এবং পাক বস্তুর মিশ্রণের 'প্রবলতা'[৪] থেকে মুক্ত সেই পানিকে ماء مطلق (বা অমিশ্র পানি) বলে। যেমন বৃষ্টির পানি, নদী ও সমুদ্রের পানি, কুয়া ও ঝর্ণার পানি এবং শিলা ও বরফগলা পানি। ماء مطلق দ্বারা তাহারাত হাছিল হয়।[১]

০ হাঁস-মুরগী, হিংস্র পাখী, সাপ, ইঁদুর-বেড়াল ইত্যাদি কোন পাত্রে মুখ দিলে ঐ পাত্রের পানি পাক এবং পাককারী। তবে ماء مطلق থাকা অবস্থায় তা দ্বারা তাহারাত হাছিল করা মাকরূহে তানযীহী হবে।

০ حدث দূর করার জন্য, কিংবা ছাওয়াব হাছিল করার জন্য[২] অযু-গোসল করলে সেই পানিকে ماء مستعمل (বা ব্যবহৃত পানি) বলে। এই পানি নিজে পাক, এবং তা দ্বারা নাজাসাত দূর হয়, কিন্তু হাদাছ দূর হয় না। এবং তা পান করা মাকরূহ।[৩]

অযু বা গোসলকারীর শরীর থেকে পৃথক হওয়ামাত্র পানিটি ব্যবহৃত (বা مستعمل) বলে গণ্য হবে।

০ পানিতে নাজাসাতের আলামত দেখা গেলে পানি অল্প হোক বা বেশী এবং আবদ্ধ হোক বা প্রবাহমান, তা না-পাক হয়ে যাবে।[৪]

প্রবাহমান পানিতে এবং আবদ্ধ বেশী পানিতে নাজাসাতের আলামত দেখা না গেলে পানি না-পাক হবে না।[৫]

আবদ্ধ অল্প পানিতে نجاسة পড়লে আলামাত দেখা যাক বা না যাক, পানি না-পাক হয়ে যাবে।

না-পাক পানি দ্বারা তাহারাত হাছিল তো হবেই না, বরং ঐ পানি কোন কিছুতে লাগলে সেটাও না-পাক হয়ে যাবে।

০ পানির হাউয যদি এত বড় হয় যে, এক পারে (হাত দ্বারা) নাড়া

---

১. الماء المطلَقُ طاهِرٌ و مُطَهِّرٌ يُطَهِّر عَنِ الأحداث وَ الأنجاس

২ – যেমন অযু থাকা অবস্থায় শুধু ছাওয়াবের নিয়তে নতুন অযু করা।

৩. الماء المستَعْمَلُ طاهر تَزول به النجاسَةُ، ولكنْ لا يَزول به الحَدَثُ

৪. ماءٌ راكِدٌ আবদ্ধ পানি। ماءٌ جارٍ প্রবাহমান পানি।

৫. وَ الماء الجاري إذا وقَعَتْ فيه نَجاسةٌ جاز الوُضُوء منه، إنْ لم يظهَرْ لها أثرٌ وَ الأثرُ طَعْمٌ أو لَون أو رِيحٌ.

দিলে অন্য পারের পানি নড়ে না, তাহলে তা বেশী পানি বলে গণ্য হবে।

এভাবেও বলা যায় যে, হাউয যদি দৈর্ঘ্যে দশ হাত এবং প্রস্থে দশ হাত হয় এবং এতটা গভীর হয় যে, হাত দিয়ে পানি নিতে গেলে মাটি জেগে ওঠে না তাহলে তা বেশী পানি। এর কম হলে তা অল্প পানি।[১]

পানিতে পাক জিনিসের মিশ্রণ

০ পানিতে মিশ্রিত পাক পদার্থ দু'প্রকার। তরল[২] এবং অতরল।[৩]

তরল-অতরল যে কোন পাক পদার্থ মিশ্রিত হওয়ার পর যদি পানির উপর প্রবল না হয় তাহলে তা مَاء مُطْلَقٌ এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং তা দ্বারা তাহারাত হাছিল হবে।

তরল-অতরল পাক পদার্থ যদি পানির উপর প্রবল হয় তাহলে তা ماء مطلق (অমিশ্র) নয়, বরং ماء مُقَيَّد (বা মিশ্র পানি)

০ مطلق পানির মত مقيد পানিও পাক, এবং তাতে إزالة এর গুণ থাকলে তা দ্বারা নাজাসাতও দূর হবে, কিন্তু তা দ্বারা হাদাছ দূর হবে না।

০ অতরল পদার্থ প্রবল হওয়ার অর্থ হলো পানির প্রকৃতিগত তরলতা ও প্রবাহতা ক্ষুণ্ন হওয়া।

সুতরাং পানিতে যদি সাবান, আটা, জাফরান, মাটি ইত্যাদি মিশ্রিত হয় এবং পানির বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু তার স্বভাব তরলতা ও প্রবাহতা অক্ষুণ্ন থাকে তাহলে তা ماء مطلق রূপেই গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি পানি গাঢ় হয়ে যায় এবং তার স্বাভাবিক তরলতা ও প্রবাহতা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তা ماء مقيد হয়ে যাবে।

০ তরল পদার্থের রং যদি পানি থেকে ভিন্ন হয় তাহলে প্রবলতা সাব্যস্ত হবে রং দ্বারা। সুতরা যদি দুধ, সিরকা ইত্যাদি মিশ্রিত হওয়ার পর পানির রং পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে তা ماء مقيد হবে।

---

১. وَ الغَدِير العظيم الذي لا يَتَحَرَّك أَحَدُ طَرَفَيه بِتَحْرِيك الطرَفِ الآخَرِ إذا وقَعَت في أَحَدِ جانِبَيْهِ نَجاسَةٌ جاز الوُضوء مِنَ الجانِب الآخَرِ .

২. যেমন দুধ, সিরকা, গোলাবজল ইত্যাদি। ৩. আটা, সাবান, মাটি ইত্যাদি।

তরল পদার্থের রং যদি পানির মত হয় তাহলে প্রবলতা সাব্যস্ত হবে স্বাদ দ্বারা। সুতরাং গোলাবজল বা কিশমিশ ভেজানো পানি মিশ্রিত হওয়ার পর যদি পানির স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে তা ماء مقيد হবে।

তরল পদার্থের যদি আলাদা রং বা স্বাদ না থাকে তাহলে প্রবলতা সাব্যস্ত হবে ওজন ও পরিমাণ দ্বারা। সুতরাং ماء مستعمل যদি মিশ্রিত হয় এবং তার পরিমাণ সাধারণ পানির চেয়ে বেশী হয় তাহলে তা ماء مقيد বলে গণ্য হবে।

o বৃক্ষ-নিসৃত বা বৃক্ষ নিংড়ানো পানি مطلق নয়, বরং مقيد

o যে সমস্ত জিনিস পানিতে মিশিয়ে জ্বাল দেয়া হয় সেগুলোর রং ও স্বাদ পানির উপর প্রবল হলেও পানি مطلق রূপেই গণ্য হবে। যেমন নিমপাতা, বড়ই পাতা (তবে পানির স্বভাব তরলতা নষ্ট হলে ভিন্ন কথা।)

o কোন পদার্থের মিশ্রণের কারণে নয়; বরং দীর্ঘ দিনের কারণে পানিতে শ্যাওলা পড়ে গেলে এবং বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তন হয়ে গেলে তা مطلق বলে গণ্য হবে।

o হাউযে বা পুকুরে গাছের পাতা বা ফল পড়ে পড়ে যদি পানির বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় তাহলেও তা مطلق বলে গণ্য হবে।

প্রশ্নমালা

১ – طهارة এর শাব্দিক অর্থ এবং শারী'আতি অর্থ বলো।

২ – نجاسة ও حدث কাকে বলে? এবং কোনটি থেকে কী ভাবে طهارة হাছিল হয়?

৩ – ماء مطلق এর পরিচয়, প্রকার ও বিধান বলো।

৪ – তুমি অযুর জন্য পানি নিলে আর তোমার পোষা বেড়াল তাতে মুখ দিলো, এখন তুমি কী করবে?

৫ – খাওয়ার আগে ও পরে দু'জন তাদের হাত ধুলো, একজন ময়লা দূর করার জন্য, অন্যজন সুন্নত আদায়ের জন্য, এখন কোন পানির কি হুকুম?

৬ – অজুর বা গোসলের জমিয়ে রাখা পানি দ্বারা অযু করা এবং তা পান করা কি জায়েয হবে ?

৭ – مستعمل (ব্যবহৃত) পানি কাকে বলে এবং তার বিধান কী এবং কখন তা مستعمل বলে গণ্য হয়?

৮ – হুজুর ইসতিন্‌জা থেকে আসার পর ছাত্র তাঁকে অযু শেখাতে বললো, আর হুজুর অযু শিক্ষা দেয়ার জন্য অযু করে দেখালেন। এই পানি কি مستعمل হবে?

৯ – হাদাছগ্রস্ত[১] ব্যক্তি আরাম লাভের জন্য পর পর দু'বার অযু করলো। উভয় অযুর পানির কী বিধান?

১০ – নদীতে এবং কুয়ায় এই পরিমাণ নাজাসাত পড়েছে যে, পানিতে নাজাসাতের আলামত দেখা যাচ্ছে না, এ দুই পানির কী হুকুম?

১১ – অল্প পানি ও বেশী পানিতে নাজাসাত পড়ার মাঝে পার্থক্য কী?

১২ – ماء كثير বা বেশী পানির পরিমাণ বর্ণনা করো।

১৩ – এক প্রকার গাছ আছে, তার গোড়া থেকে স্বচ্ছ পানি ঝরে, ঐ পানি দ্বারা এবং খেজুর গাছের রস দ্বারা কি অযু জায়েয হবে?

১৪ – পানিতে কোন পাক পদার্থ মিশ্রিত হওয়ার বিধান কী?

১৫ – মিশ্রিত পদার্থের প্রবলতা কীভাবে বোঝা যাবে, বলো।

১৬ – এক লিটার مطلق পানিতে আধা লিটার বা দেড় লিটার مستعمل পানি মিশেছে। এই পানির বিধান কী?

سُؤْرٌ এর বিধান

سؤر এর পরিচয় – মানুষ বা প্রাণীর পান-অবশিষ্ট পানিকে سؤر (বা ঝুটা) বলে। বিভিন্ন প্রাণীর سؤر বা ঝুটার বিধান বিভিন্ন। যেমন–

মানুষের سؤر বা ঝুটা পাক। হোক সে কাফির বা মুসলিম এবং হাদাছমুক্ত, বা হাদাছগ্রস্ত।[২]

---

১. مُحْدِثٌ

২. سُؤْرُ الآدَمِيِّ طَاهِرٌ و تحصُل به الطهارَةُ، مسلِمًا كان أو كافرًا، و مُحدِثا كان أو طاهِرًا

একই ভাবে ঘোড়ার ঝুটাও পাক। সুতরাং মানুষ ও ঘোড়ার ঝুটা পানি দ্বারা তাহারাত হাছিল হবে।

উট, গরু, ভেড়া-বকরী ইত্যাদি ভোজ্যপ্রাণীর[১] ঝুটাও পাক, সুতরাং মানুষ, ঘোড়া ও ভোজ্যপ্রাণীর ঝুটা পানি দ্বারা তাহারাত হাছিল হবে। তাতে কোন 'কারাহাত' নেই।

০ চিল, শকুন, বাজ ইত্যাদি হিংস্র পাখীর ঝুটা পাক। বেড়াল, সাপ, ইঁদুর ইত্যাদি যে সমস্ত প্রাণী ঘরে আনাগোনা করে তাদের ঝুটাও পাক, তবে অন্য পানি থাকা অবস্থায় এ সমস্ত পানি দ্বারা অযু করা মাকরূহে তানযীহী হবে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, মানুষ বা প্রাণীর মুখে নাজাসাত লেগে থাকলে ঐ নাজাসাতের কারণে পানি না-পাক হয়ে যাবে।

০ শূকরের ঝুটা এবং শূকর নিজেও না-পাক।

কুকুরের ঝুটা এবং বাঘ, সিংহ, নেকড়ে ইত্যাদির ঝুটা না-পাক, তবে এরা নিজেরা না-পাক নয়।

০ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ঘামের কি হুকুম? প্রাণীর ঝুটার যে হুকুম তার ঘামেরও সেই হুকুম।[২] সুতরাং মানুষ, ঘোড়া ও ভোজ্যপ্রাণীর ঘাম পানিতে পড়লে এবং শরীরে বা কাপড়ে লাগলে তা না-পাক হবে না।

প্রশ্নমালা

১ – سؤر এর পরিচয় বলো।

২ – কোন্ কোন্ প্রাণীর ঝুটা পাক, বলো।

৩ – কোন্ কোন্ প্রাণীর ঝুটা পাক, তবে মাকরূহ, বলো।

৪ – কুকুর ও শূকরের ঝুটা না-পাক, তবে উভয়ের মাঝে পার্থক্য কী?

৫ – কখন কাফিরের ঝুটা পাক, কিন্তু মুসলিমের ঝুটা না-পাক?

৬ – দু'টি বেড়াল ইঁদুর খেয়ে দু'টি পাত্রে মুখ দিলো, একটি পাত্রের পানি পাক, অন্যটির পানি না-পাক; এর কারণ ব্যাখ্যা করো।

---

১. مَأكُولُ اللَّحْمِ ভোজ্যপ্রাণী, হালাল প্রাণী।

২. يَأخُذُ عَرَقُ الحَيَوانِ حُكْمَ سُؤرِهِ

কুয়ার পানির আহকাম

○ কুয়ায় অল্প বা বেশী নাজাসাত পড়লে তার পানি না-পাক হয়ে যায়, তখন কুয়ার সমস্ত পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব হয়।

কুয়ায় শূকর পড়লে সর্বাবস্থায় পানি না-পাক হবে এবং সমস্ত পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব হবে। কেননা শূকর সত্তাগতভাবেই না-পাক।[১]

সত্তাগতভাবে না-পাক নয়, তবে তার ঝুটা না-পাক, এমন প্রাণী কুয়ায় পড়লেও পানি না-পাক হয়ে যাবে এবং সমস্ত পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব হবে। যেমন কুকুর ও বিভিন্ন হিংস্র পশু-প্রাণী।

○ মানুষ বা ভোজ্যপ্রাণী যদি কুয়ায় পড়ে জীবিত বের হয়ে আসে, আর তার শরীরে কোন নাজাসাত না থাকে তাহলে কুয়ার পানি পাক থাকবে।

○ যে সমস্ত প্রাণীর শরীরে প্রবাহিত রক্ত নেই তা কুয়ায় পড়ে মারা গেলে পানি না-পাক হবে না।[২]

যে সমস্ত প্রাণীর জন্ম ও বসবাস পানিতে তা কুয়ায় মারা গেলেও কুয়ার পানি না-পাক হবে না। যেমন মাছ, কাঁকড়া ও ব্যাঙ।

○ বকরী বা আরো বড় প্রাণী কুয়ায় পড়ে মারা গেলে কুয়ার পানি না-পাক হবে এবং সমস্ত পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব হবে। মানুষ পড়ে মারা গেলেও একই হুকুম হবে।

○ যদি সমস্ত পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব হয়, অথচ তা তোলা সম্ভব না হয় তখন দু'শ বালতি পানি তোলাই যথেষ্ট হবে।[৩]

বেড়াল, মুরগী, কবুতর ইত্যাদি মাঝারি আকারের প্রাণী কুয়ায় পড়ে মারা গেলে চল্লিশ বালতি পানি তোলাই যথেষ্ট হবে। আর ইঁদুর ও চড়ুই পাখির মত ছোট প্রাণী হলে বিশ বালতি পানি তোলাই যথেষ্ট হবে।

○ নির্ধারিত পানি তোলার পর কুয়া, বালতি, রশি সব পাক হয়ে যাবে; এমনকি যে ব্যক্তি পানি তুলেছে তার হাতও পাক হয়ে যাবে, আলাদা ভাবে তা ধুতে হবে না।

---

১. الخِنزيرُ نَجِس العَيْنِ

২. الحيَوان الذي ليس له نَفْسٌ سائِلَةٌ إذا ماتَ في البِئْرِ لا يُنَجِّسُ الماءَ

৩. إنْ وجَبَ نَزْحُ جَميعِ ماءِ البِئْرِ وَ لم يُمكِنْ إخراجُه كَفى نَزْحُ مِائَتَيْ دَلْوٍ

০ কুয়ায় উট, গরু, ছাগল, গাধা, খচ্চর ইত্যাদির গোবর ও লাদা সামান্য পরিমাণে পড়লে পানি না-পাক হবে না। কেননা সামান্য পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বেশী পরিমাণে পড়লে অবশ্য না-পাক হয়ে যাবে। যদি প্রত্যেক বালতিতে কিছু না কিছু গোবর ও লাদা উঠে আসে তাহলে তা পরিমাণে বেশী বলে গণ্য হবে।

কবুতর ও চড়ুইয়ের বিষ্ঠা পড়লেও কুয়ার পানি না-পাক হবে না।

০ বড়-ছোট যে কোন প্রাণী যদি কুয়ায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, কিন্তু কখন পড়েছে তা জানা না যায় তাহলে দেখতে হবে, মৃতদেহ ফুলে গেছে কি না, ফুলে গেলে তিন দিন থেকে কুয়ার পানি না-পাক ধরা হবে, আর ফুলে না গেলে একদিন এক রাত্র থেকে না-পাক ধরা হবে। সুতরাং এ সময়ের মধ্যে ঐ পানি দ্বারা অযু করা হলে নামায কাযা করতে হবে এবং গোসল করা হলে বা জিনিসপত্র ধোয়া হলে শরীর, কাপড় ও জিনিসপত্র ধুয়ে পাক করতে হবে।

প্রশ্নমালা

১ – কোন্ কোন্ অবস্থায় কুয়ার সমস্ত পানি তোলা ওয়াজিব?

২ – অজ্ঞাত সময় থেকে কুয়ায় একটি মরা ইঁদুর পড়ে থাকলে ঐ কুয়ার পানির কী হুকুম?

৩ – এক মাতাল কুয়ায় পড়ে জীবিত অবস্থায় বের হয়ে এলো। তার কাপড়ে বা শরীরে কোন নাজাসাত ছিলো না। অথচ কুয়া না-পাক হয়ে গেলো, বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

৪ – কুয়া পাক করার জন্য কখন কত বালতি পানি তোলা ওয়াজিব?

৫ – অজ্ঞাত সময় থেকে কুয়ায় মৃতদেহ পড়ে থাকার আহকাম বর্ণনা করো।

৬ – শূকর ও কুকুর কুয়ায় পড়ার মাঝে পার্থক্য কী ?

৭ – একটি মশা কুয়ায় পড়ে মরলো, কিন্তু পানি না-পাক হলো না, আরেকটি মশা পড়ে মরলো এবং পানি না-পাক হয়ে গেলো; বিষয়টি বুঝিয়ে বলো।

ইস্‌তিন্‌জা করার আদব

পেশাব-পায়খানা করার কয়েকটি আদব এই–

১ – বাইতুলখালায় বাম পায়ে দাখেল হওয়া এবং ডান পায়ে বের হওয়া। দাখেল হওয়ার সময় أعوذ بالله من الخُبُثِ و الخَبائِثِ এবং বের হওয়ার সময় الحمدُ لِلّه الذي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذٰى وَ عافانِي এই দু'আ পড়া।

২ – ইস্‌তিন্‌জা করার এবং ইস্‌তিন্‌জা থেকে পাক হওয়ার সময় মাথায় টুপি বা কাপড় রাখা।

৩ – বাম হাতে পানি বা ঢিলা ব্যবহার করা। (বিনা ওযরে ডান হাত ব্যবহার করা মাকরূহ।)[১]

৪ – মানুষের চলা-ফেরা ও ওঠা-বসার স্থানে. ছায়াদার ও ফলদার গাছের নীচে. নদী, কুয়া ও হাউযের নিকটে এবং কবরস্তানে ইস্‌তিন্‌জা করা মাকরূহ।

৫ – কোন গর্তের মুখে পেশাব করা উচিত নয়, কেননা গর্তে বিষাক্ত প্রাণী থাকলে দংশন করতে পারে।

৬ – বাইতুলখালায় ও খোলামাঠে কেবলামুখী বা কেবালা-পিঠ হয়ে ইস্‌তিন্‌জা করা এবং বিনা ওযরে দাঁড়িয়ে ইস্‌তিন্‌জা করা মাকরূহ।

৭ – আবদ্ধ অল্প পানিতে পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহে তাহরীমী; আর প্রবাহিত অল্প পানিতে কিংবা আবদ্ধ বেশী পানিতে পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহে তানযীহী।

৮ – ইস্‌তিন্‌জা করা এবং ইস্‌তিন্‌জা থেকে পাক হওয়ার সময় তেলাওয়াত বা যিকির করা মাকরূহ।

৯ – ইস্‌তিন্‌জার সময় বিনা প্রয়োজনে কথা বলা মাকরূহ। অবশ্য যদি অন্ধ বা অসতর্ক ব্যক্তির গর্তে পড়ার বা হোঁচট খাওয়ার আশংকা দেখা দেয় তাহলে তাকে সতর্ক করা আবশ্যক।

---

[১] يُكْرَهُ أن يبولَ قائِمًا بِدُونِ عُذْرٍ، لِأَنَّ رَشاشَ البَوْلِ قد يَتَطايَرُ على بَدَنِهِ أو على ثِيَابِه، و يُكرَه أن يَسْتَنْجِيَ بِيَمِينِه بِدُونِ عُذْرٍ

প্রশ্নমালা

১ – বাইতুলখালায় দাখেল ও খারেজ হওয়ার আদব ও দু'আ বলো।

২ – কোন্ কোন্ স্থানে ইস্‌তিন্‌জা করা মাকরূহ, বলো।

৩ – পানিতে পেশাব-পায়খানা করার হুকুম বলো।

নাজাসাতের প্রকার ও বিধান

নাপাক জিনিসকে نجاسة বলে এবং তা দু'প্রকার। غليظة ও خفيفة

০ গালীয নাজাসাত হলো– রক্ত, মদ, মুরদারের গোশত, চর্বি ও চামড়া, অভোজ্য প্রাণীর পেশাব, কুকুর ও সকল হিংস্র প্রাণীর পেশাব-পায়খানা, লালা ও ঘাম। হাঁস-মুরগীর পায়খানা এবং মানুষের শরীর থেকে যে সব জিনিস বের হলে অযু ভেঙ্গে যায় সে সব জিনিস। যেমন, রক্ত, পুঁজ, পেশাব-পায়খানা, মুখভরা বমি ইত্যাদি।

০ গালীয নাজাসাত যদি তরল হয় তাহলে এক দিরহামের আয়তন পরিমাণ[১] মাফ হবে। অর্থাৎ শরীরে বা কাপড়ে এই পরিমাণ নাজাসাত থাকা অবস্থায় নামায পড়া যাবে (তবে মাকরূহ হবে)। এর বেশী হলে নাজাসাত দূর না করে নামাজ পড়া যাবে না।

গালীয নাজাসাত যদি শক্ত হয় তাহলে একদিরহামের ওজন পরিমাণ নাজাসাত[২] মাফ হবে। অর্থাৎ এই পরিমাণ নাজাসাত শরীরে বা কাপড়ে থাকা অবস্থায় নামায পড়া যাবে (তবে মাকরূহ হবে)। এর বেশী হলে নাজাসাত দূর না করে নামায পড়া যাবে না।[৩]

০ খাফীফ নাজাসাত হলো– ঘোড়ার পেশাব, উট, গরু, বকরী ইত্যাদি হালাল প্রাণীর পেশাব ও গোবর এবং হারাম পাখীর বিষ্ঠা।

খাফীফ নাজাসাত শরীরের বা কাপড়ের কোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশের কম হলে তা মাফ। এক চতুর্থাংশ বা তার বেশী হলে মাফ নয়। অর্থাৎ ঐ নাজাসাত দূর না করে নামায পড়া জায়েয হবে না।

---

১. হাতের তালুর তলা পরিমাণ।

২. প্রায় তিন গ্রাম।

৩. يُعْفَى عَنِ النجاسَةِ الغَلِيظَةِ إذا كانت قَدْرَ الدِّرْهَمِ

কয়েকটি মাসআলা

১ – সুঁইয়ের মাথার মত ছোট ছোট পেশাবের ছিটা মাফ। কেননা তা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।[১]

২ – শরীরের ঘামে বা পায়ের ভেজায় যদি নাপাক কাপড় বা বিছানা ভিজে যায়, আর শরীরে বা পায়ে নাপাকির চিহ্ন দেখা যায় তাহলে শরীর ও পা নাপাক হয়ে যাবে। নাপাকির চিহ্ন দেখা না গেলে নাপাক হবে না।

৩ – শুকনো নাপাক মাটিতে ছড়িয়ে দেয়া ভেজা কাপড়ে নাজাসাতের চিহ্ন দেখা দিলে কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। নাজাসাতের চিহ্ন দেখা না দিলে নাপাক হবে না। (এসব ক্ষেত্রে আসল দেখার বিষয় হলো, নাজাসাতের চিহ্ন প্রকাশ পাওয়া, না পাওয়া)

৪ – চিপলে পানি পড়ে না, এমন ভেজা নাপাক কাপড়ে শুকনো পাক কাপড় পেঁচিয়ে রাখলে ঐ শুকনো কাপড় নাপাক হবে না।

৫ – নাজাসাতের উপর দিয়ে বয়ে আসা বাতাস যদি ভেজা কাপড়ে লাগে, আর তাতে নাজাসাতের চিহ্ন দেখা যায় তাহলে ঐ কাপড় নাপাক হয়ে যাবে, নাজাসাতের চিহ্ন দেখা না গেলে নাপাক হবে না।

প্রশ্নমালা

১ – গালীয ও খাফীফ নাজাসাত কী কী বলো।

২ – গালীয ও খাফীফ নাজাসাতের বিধান উল্লেখ করো।

৩ – বমি কখন নাপাক বলে গণ্য হবে?

৪ – পেশাবের ছিঁটা কী পরিমাণ হলে মাফ হবে?

৫ – চিপলে পানি পড়ে এমন ভেজা নাপাক কাপড়ে শুকনো পাক কাপড় পেঁচিয়ে রাখার হুকুম বলো।

৬ – নাজাসাতের উপর দিয়ে বয়ে আসা বাতাস ভেজা কাপড়ে লাগলে ঐ কাপড়ের কী হুকুম?

---

৩. يُعْفَى عَنْ رَشَاشِ الْبَوْلِ إذا كانَ مِثْلَ رُؤُوسِ الإبَرِ، لِأَنه لا يُمكِنُ الِاحْتِرازُ عنه

নাজাসাত দূর করার উপায়

০ শরীরী নাজাসাত থেকে তাহারাত হাছিলের উপায় হলো ধুয়ে নাজাসাতের শরীর দূর করা। একবার ধোয়া দ্বারা দূর হোক, কিংবা বেশী বার। নাজাসাতের শরীর দূর হওয়ার পর তার চিহ্ন তথা রং বা গন্ধ দূর করা কষ্টকর হলে তা দূর করা জরুরী নয়।

শরীরী নাজাসাত মানে শুকিয়ে যাওয়ার পরও যার শরীর বিদ্যমান থাকে।[১] যেমন, রক্ত, বমি, পায়খানা।

০ অশরীরী নাজাসাত থেকে তাহারাত হাছিল করার উপায় হলো নাজাসাত দূর হওয়ার প্রবল ধারণা হওয়া পর্যন্ত নতুন নতুন পানি দিয়ে ধুতে থাকা। তবে ফকীহগণ সহজতার জন্য প্রতিবার নতুন পানিতে তিনবার ধোয়ার কথা বলেছেন। (চিপা সম্ভব জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে) প্রতিবার পানির ফোঁটা পড়া বন্ধ হওয়া পর্যন্ত চিপতে হবে।

অশরীরী নাজাসাত মানে শুকিয়ে যাওয়ার পর যার শরীর থাকে না, শুধু দাগ থাকে। যেমন পেশাব, মদ।

০ নাজাসাত দূর হয় পানি দ্বারা এবং এমন তরল পদার্থ দ্বারা যার নাজাসাত দূর করার যোগ্যতা রয়েছে।[২] যেমন সিরকা ও গোলাবজল। তেল, মধু ও চর্বি দ্বারা নাজাসাত দূর হবে না।

কয়েকটি মাসআলা

১ – চামড়া, রাবার বা প্লাস্টিকের জুতায় লাগা শরীরী নাজাসাত পাক মাটিতে ঘষে মুছে ফেললে পাক হয়ে যাবে, নাজাসাত শুকনো হোক বা ভেজা। কিন্তু অশরীরী নাজাসাত– মদ, পেশাব– ধোয়া ছাড়া পাক হয় না।

২ – ছুরি, তলোয়ার, আয়না ও পালিশ করা পাত্র মুছলেই পাক হয়ে যায়।

৩ – মাটি শুকিয়ে গেলে এবং নাজাসাতের চিহ্ন দূর হয়ে গেলে তা নামাযের জন্য পাক হয়ে যায়, তায়াম্মুমের জন্য পাক হয় না।

---

১. وَ النجاسَةُ المَرْئِيَّةُ ما يَبْقَى لها جِرْمٌ بَعد الجَفافِ

২. وَ تُزال النجاسَةُ بالماءِ وَ بِكُلِّ مائِعٍ مُزيلٍ، كَالخَلِّ و ماءِ الوَرْدِ

৪ – মুরদার পশুর চামড়া দাবাগাত দ্বারা পাক হয়ে যায়। দাবাগাত মানে অষুধ দিয়ে, রোদে শুকিয়ে বা মাটি মেখে চামড়াকে শোধন করা।[১]

৫ – যে কোন পশুর চামড়া শরীয়তী জবাই দ্বারা পাক হয়ে যায়।

৬ – মানুষের চামড়া দাবাগাত দ্বারা পাক হয়, তবে চিকিৎসায় বা অন্য কিছুতে তা ব্যবহার করা জায়েয নয়। কেননা মানুষের চামড়া বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করা মানুষের মর্যাদার পরিপন্থী।

৭ – মৃত্যুর পর রক্ত শরীরে মিশে যায় বলে শরীর না-পাক হয়ে যায়। সুতরাং শরীরের যে সব অংশে রক্তের প্রবেশ নেই তা না-পাক হয় না। যেমন চুল, পালক, শিং, হাড়। তবে তাতে চর্বি লেগে থাকলে চর্বির কারণে তা না-পাক হবে।

প্রশ্নমালা

১ – শরীরী নাজাসাত এবং অশরীরী নাজাসাতের পরিচয় দাও।

২ – কাপড় ধুয়ে নাজাসাত দূর করার পর তাতে নাজাসাতের দাগ থেকে গেলে তার কী হুকুম ?

৩ – কাপড়কে অশরীরী নাজাসাত থেকে পাক করার উপায় বলো।

৪ – জুতা ও মোজা পাক করার উপায় কী কী?

৫ – চিনা মাটি, স্টিল এবং কাঁচের পাত্র পাক করার উপায় কী কী?

৬ – কোন ছূরতে পশুর চামড়া দাবাগাত ছাড়াই পাক হবে।

৭ – শূকরের চামড়া কি দাবাগাত দ্বারা পাক হবে? কারণসহ বলো।

৮ – নাজাসাত-পড়া মাটির উপর নামায পড়া এবং সেই মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার কী হুকুম?

৯ – মৃত পশুর সমস্ত শরীর না-পাক নয়, কথাটা ব্যাখ্যা করো।

---

১. كُلُّ إِهابٍ دُبِغَ فقَدْ طَهُرَ، جازَتِ الصلاةُ فيه وَ الوُضوءُ مِنه إلَّا جِلْدَ الخِنْزِيرِ و يَطْهُرُ جِلدُ الآدَمِيِّ بِالدِّباغَة، و لكنْ لا يجوزُ اسْتِعمالُه .

অযুর বিধান

وُضُوء অর্থ পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য এবং وَضُوء অর্থ অযু করার পানি। শারী'আতের পরিভাষায় وُضُوء অর্থ পানি দ্বারা চেহারা, হাত ও পা ধোয়া এবং মাথা মসেহ করা।

অযুর চার ফরয। ১. একবার করে চেহারা ধোয়া। ২. কনুইসহ দুই হাত ধোয়া। ৩. মাথার চারভাগের একভাগ মসেহ করা। ৪. গোড়ালিসহ দুই পা ধোয়া।[১]

চেহারার সীমানা হলো মাথার চুলের শুরু থেকে চিবুকের নীচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত।

অযুর সুন্নাত হলো–

১ – অযুর শুরুতে নিয়ত করা এবং بسم الله الرحمن الرحيم বলা।

২ – প্রথমে কব্‌যি পর্যন্ত দুই হাত ধোয়া।

৩ – মেছওয়াক করা (মেছওয়াক না পেলে আঙ্গুল ব্যবহার করা)

৪ – তিনবার করে কুলি ও গরগরা করা।

৫ – প্রতিবার নতুন পানি নিয়ে প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ভালোভাবে ডলে ধোয়া।

৬ – একই পানিতে পুরো মাথা এবং দুই কানের ভেতর ও বাহির মসেহ করা।

৭ – নীচের দিক থেকে দাড়ি খেলাল করা এবং হাতের ও পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা।

৮ – প্রথম অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার আগে দ্বিতীয় অঙ্গ ধোয়া।

৯ – চেহারা, হাত, মাথা ও পা– এই তরতীব রক্ষা করা এবং ডান হাত ও ডান পা আগে ধোয়া।

১০ – মাথার সামনে থেকে মাসেহ শুরু করা এবং ঘাড় মাসেহ করা।

---

১. فَرْضُ الْوُضُوءِ غَسْلُ الوَجْهِ و اليَدَيْنِ معَ المِرْفَقَيْنِ و مَسْحُ رُبُعِ الرأس و غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مع الكَعْبَيْن، و حَدُّ الوَجْهِ من أعلَى الجَبْهَةِ إلى أَسْفَلِ الذَّقَنِ و مِنْ شَحْمَةِ الأُذُنِ إلى شَحْمَةِ الأُذُنِ .

অযুর মুস্তাহাবসমূহ

অযুর মুস্তাহাব হলো–

১ – পাক জায়গায় কেবলামুখী হয়ে বসা।

২ – উঁচু স্থানে বসা, যাতে পানির ছিটা কাপড়ে ও শরীরে না লাগে।

৩ – অঙ্গ ধোয়া ও মসেহ্ করার ক্ষেত্রে কারো সাহায্য না নেয়া।

৪ – কথা না বলে অযুর মাসনূন দু'আ পড়া।

৫ – প্রত্যেক অঙ্গে بسم الله الرحمن الرحيم পড়া।

৬ – কুলি ও গরগরার পানি ডান হাতে নিয়ে বাম হাতে নাক ঝাড়া।

৭ – ওয়াক্ত হওয়ার আগে অযু করা।

৮ – দাঁড়িয়ে কেবলামুখী হয়ে অযুর বেঁচে যাওয়া পানি থেকে পান করা এবং এই দু'আ পড়া–

أَشْهَد أن لا إلـه إلا اللّٰه، وَحْدَه لا شريكَ لـه، و أشهَد أنَّ محمدًا عبدُه و رسولُـه، اللهمَّ اجْعَلْني مِنَ التَّوابِين وَ اجْعلني من المتَطَهِّرين

চার ফরয আদায় করলেই অযু হয়ে যায়; তবে অযুর যাবতীয় সুন্নাত ও মুস্তাহাবের উপর যত্নের সঙ্গে আমল করা উচিত, যাতে অযু পূর্ণাঙ্গ হয় এবং পূর্ণ ছাওয়াব হাছিল হয়।

কয়েকটি মাসআলা

১ – অযুর অঙ্গে যদি এমন কিছু থাকে যাতে পানি চামড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না তাহলে তা দূর করে নীচে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব, অন্যথায় অযু হবে না। যেমন মোম, আটা।

২ – লম্বা নখের নীচে পানি না পৌঁছলে অযু হবে না। সুতরাং নখ বড় রাখা উচিত নয়।

৩ – আংটি যদি এমন হয় যে, না নাড়লে ভিতরে পানি পৌঁছে না, তাহলে নেড়ে ভিতরে পানি পৌঁছাতে হবে, আর যদি ঢিলা হয় তাহলে নাড়া মুস্তাহাব।

৪ – মাসেহ্‌র পর মাথা কামালে আবার মাসেহ করতে হবে না।

তদ্রূপ অযুর পর নখ-মোচ কাটলে তা আবার ধুতে হবে না।

৫ – চেহারায় জোরে পানি নিক্ষেপ করা মাকরূহ। কেননা তাতে পানির ছিটা নিজের একং অন্যের গায়ে লাগতে পারে।

৬ – নদীর পারে অযু করলেও প্রয়োজনের বেশী পানি খরচ করা মাকরূহ, আবার প্রয়োজনের কম খরচ করাও মাকরূহ।

প্রশ্নমালা

১ – وضوء শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বলো।

২ – চেহারা ধোয়ার সীমানা বলো।

৩ – অযুর সুন্নাতগুলো বলো।

৪ – আংটি কখন নাড়া ফরয এবং কখন নাড়া মুস্তাহাব?

৫ – আলতা, নেলপালিশ বা ঠোঁটপালিশ এবং হাতের মেহদির রং এর মাঝে পার্থক্য কী বলো।

অযুভঙ্গের কারণসমূহ

অযুভঙ্গের কারণ ছয়টি, যথা–

১ – পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া।[১]

২ – রক্ত, পুঁজ বের হওয়া এবং অযু বা গোসলে ধোয়া হয় এমন স্থানে এসে পড়া।

৩ – মুখ ভরে বমি হওয়া। (অল্প বমি অযুভঙ্গের কারণ নয়। আর বেশী অর্থ এই পরিমাণ যা মুখের ভিতরে ধরে রাখা সম্ভব নয়।)

৪ – পূর্ণ শিথিল শরীরে ঘুমিয়ে পড়া। যেমন চিত হয়ে, কাত হয়ে, এক নিতম্বের উপর বসে এবং কোন কিছুতে এমনভাবে হেলান দিয়ে ঘোমানো যে, তা সরালে পড়ে যাবে।

৫ – বেহুঁশ হওয়া, পাগল হওয়া এবং মাতাল হওয়া।

৬ – রুকূ-সিজদার নামাযে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির শব্দ করে হাসা (যা পাশের ব্যক্তি শুনতে পায়)

---

১. يَنْقُضُ الْوُضُوءَ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ

সুতরাং রুকূ-সিজদার নামাযে বালক বা ঘুমন্ত ব্যক্তি হাসলে অযু ভঙ্গ হবে না। তদ্রূপ জানাযার নামাযে বা তিলাওয়াতের

• সিজদায় হাসলে কারো অযুই ভঙ্গ হবে না।

কয়েকটি মাসআলা

১ – রক্ত ও পুঁজ জখম থেকে গড়িয়ে বের না হলে অযু ভঙ্গ হবে না। যেমন, জখমের চামড়া তোলা হলো এবং রক্ত দেখা দিলো, বা ফুলে উঠলো, কিন্তু জখমের মুখ থেকে গড়িয়ে বের হলো না।

২ – জখমের রক্ত, পুঁজ বারবার তুলা দিয়ে মুছে ফেলার পর যদি মনে হয় যে, না মুছলে গড়িয়ে বের হতো তাহলে অযু ভঙ্গ হবে।

৩ – কামড় দেয়া আপেলের গায়ে, কিংবা খেলালের মাথায় রক্তের চিহ্ন দেখা দিলে তাতে অযু ভঙ্গ হবে না।

৪ – থুথু লাল হলে, অর্থাৎ রক্তের পরিমাণ থুথুর চেয়ে বেশী বা সমান হলে অযু ভঙ্গ হবে। আর যদি শুধু লালচে ভাব থাকে, অর্থাৎ রক্তের পরিমাণ থুথুর চেয়ে কম হয় তাহলে অযু ভঙ্গ হবে না।

৫ – বমি যদি খাদ্য বা পানি হয় তখন কম-বেশীর প্রশ্ন। যদি রক্ত বমি করে তাহলে কম হোক, বা বেশী, তাতে অযু ভঙ্গ হবে।

প্রশ্নমালা

১ – অযুভঙ্গের কারণগুলো সংক্ষেপে বলো।

২ – কিডনির পাথর পেশাবের রাস্তায় বের হলে অযুর কী হুকুম ?

৩ – কানের ভিতরে বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হলে কি অযু ভঙ্গ হবে?

৪ – বমি কখন অযুভঙ্গের কারণ হবে, কখন হবে না, বলো।

৫ – জানাযার নামাযে বড় মানুষ শব্দ করে হাসলো, কিংবা নফল বা ফরয নামাযে ছোট শিশু শব্দ করে হাসলো, এখন তাদের অযুর কী হুকুম হবে, বিশদভাবে বলো।

৭ – নামাযে দাঁড়িয়ে, রুকূতে ও সিজদায় গিয়ে কিংবা তাশাহ্হুদের বৈঠকে ঘুমিয়ে পড়লে কি অযু ভঙ্গ হবে? ঘুম কখন অযুভঙ্গের কারণ হবে ?

তায়াম্মুমের আহকাম

অযু-গোসলের জন্য পানির প্রয়োজন। কিন্তু পানি যদি না পাওয়া যায়, কিংবা পানি আছে, তবে সংগ্রহ করতে বা ব্যবহার করতে পারছে না তখন কী করবে? এ রকম জরুরী অবস্থায় বান্দার জন্য শারী'আত অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুমের ব্যবস্থা করেছে, যাতে বান্দা নামায পড়তে পারে।

০ تيمم এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। শারী'আতের পরিভাষায় তায়াম্মুম অর্থ নিয়ত করে 'পূর্ণ' পাক মাটি দ্বারা চেহারা মাসেহ করা এবং কনুইসহ দুই হাত মাসেহ করা। তায়াম্মুম ছহী হওয়ার ছয়টি শর্ত। যথা–

১. নিয়ত করা। সুতরাং নিয়ত ছাড়া শুধু মাটিতে হাত রেখে মুখ ও হাত মাসেহ করলে তায়াম্মুম হবে না। কিন্তু অযুতে নিয়ত শর্ত নয়। সুতরাং কেউ যদি বৃষ্টিতে ভেজে বা পানিতে পড়ে যায় এবং অঙ্গগুলো ভিজে যায় তবে তার অযু হয়ে যাবে।

০ শুধু 'হাদাছ' থেকে পাক হওয়ার নিয়তে তায়াম্মুম করলে সেই তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ ছহী হবে। তদ্রূপ যদি 'তাহারাত-নির্ভর' মৌল ইবাদত-এর নিয়তে তায়াম্মুম করে তবে তা দ্বারা নামায ছহী হবে। যেমন নামায ও তিলাওয়াতি সিজদার নিয়তে তায়াম্মুম করা।

মাছহাফ ধরার নিয়তে তায়াম্মুম করলে তা দ্বারা নামায ছহী হবে না। কেননা মাছহাফ ধরা ইবাদত নয়, ইবাদত হলো তিলাওয়াত করা।

আযান বা ইকামাতের নিয়তে তায়াম্মুম করলে তা দ্বারা নামায ছহী হবে না। কেননা এ দু'টি মৌল ইবাদত নয়, বরং মৌল ইবাদত তথা নামাযের প্রতি আহ্বানমাত্র।

২. তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার শরীয়তসম্মত ওযর থাকা। আর শরীয়ত-সম্মত ওযর হলো পানি না পাওয়া, কিংবা পানি ব্যবহারে সক্ষম না হওয়া।

৩. ভূমিজাতীয় 'পূর্ণ' পাক বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা। যেমন, মাটি, পাথর, বালু। সুতরাং কাঠ, কয়লা, লোহা, তামা, রূপা, সোনা দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না, তবে সেগুলোর উপর ধূলো থাকলে ধূলোর কারণে তায়াম্মুম হয়ে যাবে।

৪. সমগ্র চেহারা এবং কনুইসহ সমগ্র হাত মাসেহ করা। সুতরাং

আংটি বা চুড়ি থাকলে তা খুলে ফেলতে হবে কিংবা নাড়া-চাড়া করে তার নীচে মাসেহ করতে হবে এবং আঙ্গুল খেলাল করতে হবে এবং আটা, মোম বা নেলপালিশ থাকলে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে, যেমন অযুর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

৫. সমগ্র হাত বা হাতের অধিকাংশ দ্বারা মাসেহ করা। সুতরাং এক বা দুই আঙ্গুল দ্বারা মাসেহ করলে তায়াম্মুম ছহী হবে না।

৬. চেহারা মাসেহ করার জন্য একবার এবং দু'হাত মাসেহ করার জন্য একবার – মোট দু'বার দু'হাতের তালু দ্বারা মাটিতে 'যারব' করতে হবে।[১]

অবশ্য মুখে ও হাতে মাটি বা ধূলো লেগে থাকলে এবং তায়াম্মুমের নিয়তে মাসেহ করে নিলে 'যারব' ছাড়াই তায়াম্মুম ছহী হয়ে যাবে।

তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার ওযরসমূহ

১. পানি না পাওয়া, অর্থাৎ পানি এক মাইল বা আরো বেশী দূরে থাকা। চাই সে লোকালয়ে থাকুক বা মরুভূমিতে। তবে পানি সংগ্রহ করার সহজ উপায় থাকলে এক মাইলের বেশী দূরে হলেও পানি সংগ্রহ করতে হবে। তদ্রূপ খুব কাছের পানিও যদি সংগ্রহ করার উপায় না থাকে তাহলে তায়াম্মুম জায়েয হবে।

২. পানি ব্যবহারে সক্ষম না হওয়া। যেমন–

(ক) প্রবল ধারণা হলো কিংবা অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার সিদ্ধান্ত দিলো যে, পানি ব্যবহার করলে অসুস্থ হওয়ার কিংবা অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার অথবা আরোগ্য বিলম্বিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

(খ) প্রবল ধারণা হলো যে, শীতে ঠাণ্ডা পানিতে অযু করলে ক্ষতি হবে, অথচ পানি গরম করার ব্যবস্থা নেই।

(গ) পানি এত অল্প যে, অযু-গোসলে তা ব্যয় করলে নিজের বা অন্যের খাবার পানির সংকট দেখা দেবে।

৩. সময় সংকীর্ণতা। অর্থাৎ জানাযা ও ঈদের নামাযের ক্ষেত্রে এমন

---

১. التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ و ضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلى المِرْفَقَيْنِ

আশংকা হওয়া যে, অযু করতে গেলে জানাযা বা ঈদের নামায ফাওত হবে। জুমু'আ বা ওয়াক্তিয়া নামায ফাওত হওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করা যাবে না, বরং অযু করে যোহর পড়বে বা কাযা পড়বে।

তায়াম্মুমের রোকন

তায়াম্মুমের রোকন দু'টি– সমস্ত চেহারা মাসেহ করা এবং কনুইসহ দুই হাত মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের সুন্নত ছয়টি। যথা–

১ – শুরুতে بسم الله الرحمن الرحيم বলা।

২ – তারতীব মত চেহারা, ডান হাত ও বাম হাত মাসেহ করা।

৩ – চেহারা ও হাত মাসেহ- এর মাঝে অন্য কোন কাজ না করা।

৪ – দু'হাত মাটিতে রেখে সামান্য আগে-পিছে টান দেয়া।

৫ – মাটি থেকে হাত তুলে (বুড়ো আঙ্গুলের গোড়ার দিকে দু'হাত লাগিয়ে) ঝাড়া দেয়া।

৬ – মাটিতে হাত রাখার সময় আঙ্গুগুলো ফাঁক করে রাখা।

এভাবে তায়াম্মুম করো

প্রথমে بسم الله الرحمن الرحيم বলো, তারপর নামাযের জন্য তায়াম্মুমের নিয়ত করো। আঙ্গুল ফাঁক করে দু'হাতের তালু 'পূর্ণ' পাক মাটিতে রাখো এবং একটু আগে-পিছে টান দাও। দু'হাতের তালু মাটি থেকে তোলো এবং দুই বুড়ো আঙ্গুলের দিক থেকে মিলিয়ে ঝাড়া দাও। এবার দু'হাতের তালু দ্বারা সমস্ত চেহারা মাসেহ করো।

একই ভাবে দ্বিতীয় 'যারব' করো এবং বাম হাতের চার আঙ্গুলের ভিতরের অংশ দ্বারা ডান হাতের বাইরের অংশ আঙ্গুল থেকে শুরু করে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করো, তারপর বাম হাতের তালুর ভিতরের অংশ দ্বারা ডান হাতের ভিতরের অংশ কনুই থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত মাসেহ করো। এবার ডান হাত দিয়ে বাম হাত একই নিয়মে মাসেহ করো।

তায়াম্মুমভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে অযু ভঙ্গ হয় সেসব কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়। আবার তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার ওযর দূর হয়ে গেলেও তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়।[১]

কয়েকটি মাসআলা

১ – ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগে আগে পানি পাওয়ার প্রবল ধারণা হলে তায়াম্মুম না করে পানির জন্য অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। আর কেউ পানি দেয়ার ওয়াদা করে থাকলে অপেক্ষা করা ওয়াজিব।

২ – যদি ধারণা হয় যে, সফরসঙ্গীর কাছে পানি চাইলে না করবে না, তাহলে পানি চাওয়া ওয়াজিব, আর না দেয়ার ধারণা হলে চাওয়া ওয়াজিব নয়।

৩ – মাযূর না হলে ওয়াক্তের আগেই তায়াম্মুম করা যায় এবং এক তায়াম্মুমে যত ইচ্ছা ফরয ও নফল পড়া যায়।

৪ – যার দুই হাত এবং দুই পা কাটা এবং মুখে জখম, সে তাহারাত ছাড়াই নামায পড়বে।

৫ – অঙ্গের অর্ধেক বা বেশী জখম হলে তায়াম্মুম করবে, আর অঙ্গের অধিকাংশ সুস্থ হলে অযু করবে এবং জখম অংশে মাসেহ করবে।

৬ – মাল-সামানের সঙ্গে থাকা পানির কথা ভুলে গিয়ে তায়াম্মুম করে নামায পড়লো, তারপর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগে বা পরে পানির কথা মনে পড়লো, এক্ষেত্রে নামায দোহরাতে হবে না।[২]

৭ – পানি কাছেই ছিলো, কিন্তু তার জানা ছিলো না এবং ধারণাও ছিলো না, এক্ষেত্রে তায়াম্মুমের নামায দোহরাতে হবে না।

প্রশ্নমালা

১ – তায়াম্মুম এর আভিধানিক ও শরীয়তি অর্থ বলো।

---

১. وينقُضُ التيممَ ما يَنْقُضُ الوُضوءَ، و ينقُضه أيضًا القُدْرَةُ على الماء

২. وَ المسافِرُ إذا نَسِي الماءَ في رَحْلِه و تَيَمَّمَ وَ صلى، ثم ذَكَرَ الماءَ في الوقتِ لم يُعِدْ صلاتَه

২ – তায়াম্মুম ছহী হওয়ার জন্য কী নিয়ত করতে হবে এবং তায়াম্মুম দ্বারা নামায ছহী হওয়ার জন্য কী নিয়ত করতে হবে, বলো।

৩ – মসজিদে প্রবেশ করার নিয়তে, কিংবা কবর যিয়ারাতের নিয়তে তায়াম্মুম করলে তা দ্বারা নামায পড়া যাবে না কেন?

৪ – তাওয়াফের নিয়তের তায়াম্মুম দ্বারা কি নামায ছহী হবে ?

৫ – তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার শরীয়তসম্মত ওযর কী কী?

৬ – পানি ব্যবহারে সক্ষম না হওয়ার ছূরত কী কী?

৭ – তুমি কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছো, কিন্তু পানি তোলার কোন উপায় নেই, এ অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয হবে কি না?

৮ – সুন্নাত মোতাবেক তায়াম্মুম করে দেখাও।

৯ – 'সময়-সংকীর্ণতার কারণে তায়াম্মুম জায়েয হয়', ব্যাখ্যা করো।

১০ – শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত তায়াম্মুম বিলম্বিত করার হুকুম বলো।

১১ – সফরসঙ্গীর কাছে পানি থাকার হুকুম আলোচনা করো।

মোযার উপর মাসেহ-এর বিধান

শীত অঞ্চলে মানুষ চামড়ার মোযা ব্যবহার করে। অযুর সময় বারবার মোযা খুলে পা ধোয়া খুব কষ্টকর। তাই শরীয়ত মানুষের সহজতার জন্য অযুর সময় পা ধোয়ার পরিবর্তে মোযার উপর মাসেহ করার বিধান দিয়েছে। তবে মাসেহ জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হলো–

১ – পূর্ণ তাহারাত হাছিল করার পর মোযা পরা কিংবা আগে দু'পা ধুয়ে অযু পূর্ণ করার আগেই মোযা পরা, তবে অযু শেষ হওয়ার আগে হাদাছগ্রস্ত না হওয়া।

২ – এমন মোযা পরা যা গোড়ালিকে ঢেকে ফেলে এবং ফিতা দিয়ে বাঁধা ছাড়াই পায়ের সাথে লেগে থাকে এবং তা পায়ে দিয়ে সহজে অনবরত হাঁটা যায় (মোজা খুলে যায় না)।

৩ – মোযা দু'টিতে বেশী ছেঁড়া না থাকা। (বেশীর অর্থ ঐ ছেঁড়া দিয়ে পায়ের ছোট তিন আঙ্গুল পরিমাণ স্থান দেখা যাওয়া।)

৪ – পায়ের ভেতরে পানি পৌঁছতে না পারা।

মোযার ক্ষেত্রে মাসেহ-এর ফরয পরিমাণ হলো প্রতিটি পায়ের পাতার উপরের অংশে হাতের সবচে' ছোট তিন আঙ্গুল পরিমাণ। আর মাসেহ-এর সুন্নাত তরীকা হলো, হাতের আঙ্গুলগুলোকে ফাঁক করে পায়ের আঙ্গুলের মাথা থেকে পায়ের গোছা পর্যন্ত টেনে নেয়া।

মাসেহ-এর সময়সীমা

মুকীম একদিন একরাত, আর মুসাফির তিনদিন তিনরাত মোযার উপর মাসেহ করতে পারে।[১] আর মোযা পরার সময় থেকে নয়, বরং মোযা পরার পর হাদাছ্গ্রস্ত হওয়ার সময় থেকে মাসেহ-এর মেয়াদ গণনা করা হবে। তবে এর মাঝে মাসেহ ভঙ্গের কারণ প্রকাশ পেলে মসেহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর মাসেহ ভঙ্গের কারণ হচ্ছে–

(ক) অযুভঙ্গের কারণসমূহ। (এই ছূরতে অযু করার সময় মোযা না খুলে শুধু নতুন মাসেহ করতে হবে।)

(খ) মোযা খুলে ফেলা। (গ) মাসেহ-এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া।[২]

(এ দুই ছূরতে নতুনভাবে পা ধুয়ে মোযা পরতে হবে।)

কয়েকটি মাসআলা

১ – মুকীম যদি মাসেহ শুরু করার পর একদিন একরাত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সফরে বের হয় তাহলে সে মুসাফিরের মেয়াদ পূর্ণ করবে।

২ – মুসাফির মাসেহ শুরুর একদিন একরাত্র পর মুকীম হলে তার মাসেহ-এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে একদিন একরাত্র পূর্ণ করার আগেই মুকীম হলে সে মুকীমের মেয়াদ পূর্ণ করবে।

৩ – মাথা মাসেহ করার পরিবর্তে পাগড়ী, টুপি, বোরকা ইত্যাদির উপর মাসেহ করা জায়েয নয়, তদ্রূপ হাত ধোয়ার পরিবর্তে দস্তানার উপর মাসেহ করা জায়েয নয়।

---

١. وَيَمْسَحُ المقِيمُ يومًا و لَيْلَةً و المسافِرُ ثلاثَةَ أيّامٍ و لَيَالِيَها

٢. و يَنْقُضُ المَسْحَ ما ينقُض الوضوءَ و ينقُضه أيضا نَزْعُ الخُفِّ و مُضِيُّ المدّةِ

পট্টি বা প্লাস্টারের উপর মাসেহ্ করার বিধান

০ আহত অঙ্গে যদি পট্টি বা প্লাস্টার বাঁধা হয়, আর ঐ অঙ্গ ধোয়া বা মাসেহ করা সম্ভব না হয় তাহলে পট্টি বা প্লাস্টারের অধিকাংশের উপর মাসেহ করবে এবং জখম শুকোনোর আগ পর্যন্ত মাসেহ্ করার অনুমতি বহাল থাকবে, এমনকি তাহারাত অবস্থায় পট্টি বা প্লাস্টার বাঁধাও শর্ত নয়।

০ একপায়ের প্লাস্টারের উপর মাসেহ্ করা এবং অন্য পা ধোয়া জায়েয আছে। আর জখম শুকোনোর আগে পট্টি বা প্লাস্টার খুলে গেলে মাসেহ বাতিল হয় না।

০ প্রয়োজনে পট্টি বা প্লাস্টার বদলানো যাবে. সেক্ষেত্রে মাসেহ্-এর নবায়নও জরুরী নয়।

০ মোযা, পট্টি ও প্লাস্টারের উপর মাসেহ্ করার জন্য নিয়ত করা শর্ত নয়। তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেই শুধু নিয়ত শর্ত।

প্রশ্নমালা

১ – মোযার উপর মাসেহ্ জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ আলোচনা করো।

২ – কেউ প্রথমে পা ধুয়ে মোযা পরলো এবং চেহারা ও হাত ধোয়ার পর মাথা মাসেহ করার আগে হাদাছগ্রস্ত হয়ে পড়লো। এক্ষেত্রে নতুন অযু করার সময় মোযার উপর মাসেহ করা যথেষ্ট হবে কি না? বিশদভাবে আলোচনা করো।

৩ – মাসেহ্-এর মেয়াদ কী? এবং কখন থেকে মেয়াদ শুরু হয়?

৪ – মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে মোযা খুলে যাওয়া এবং জখম শুকোনোর আগে পট্টি খুলে যাওয়ার মাঝে পার্থক্য কী?

৫ – মোযার উপর মাসেহ্ এবং পট্টি ও প্লাস্টারের উপর মাসেহ্-এর মাঝে তিনটি পার্থক্য আছে, বিশদভাবে উল্লেখ করো।

নামাযের বিধান

নামায ইসলামের পাঁচ রোকনের দ্বিতীয় রোকন এবং শ্রেষ্ঠ ইবাদত, কেননা তা আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক ও বন্ধন সৃষ্টি করে। নামায সম্পর্কে কোরআন হাদীছে জোর তাকীদ ও ফযীলত এসেছে। সুতরাং নামাযের প্রতি আমাদের খুব যত্নবান হওয়া উচিত এবং নামাযের মাসায়েল জেনে পূর্ণ হক আদায় করে নামায পড়া উচিত। আর মা-বাবারও কর্তব্য সাত বছর বয়স থেকে সন্তানকে নামাযের আদেশ করা এবং দশ বছর বয়স থেকে নামাযে অবহেলার জন্য প্রহার দ্বারা শাসন করা, যাতে নামায ফরয হওয়ার আগেই তারা ওয়াক্তমত নামায পড়তে অভ্যস্ত হয়ে যায়

০ صلاة এর আভিধানিক অর্থ হলো যে কোন কল্যাণের দু'আ। আর শারী'আতের পরিভাষায় صلاة অর্থ বিশেষ কিছু আচরণ ও উচ্চারণ, যার সূচনা হলো তাকবীর দিয়ে এবং সমাপ্তি হলো সালাম দিয়ে।

০ নামায তিন প্রকার– ফরয, ওয়াজিব ও নফল।

ফরয হলো প্রতিদিনের পাঁচওয়াক্ত নামায (এবং জুমু'আর নামায)

ওয়াজিব নামায হলো চারটি– বিতির, দুই ঈদের নামায, শুরু করার পর ভঙ্গ করা নফল নামায এবং তাওয়াফের দু'রাক'আত।

০ নামায ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হলো মুসলিম হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া এবং সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া। সুতরাং কাফিরের উপর, বালকের উপর এবং পাগলের (মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির) উপর নামায ফরয হবে না।

সুন্নাত নামায দু' প্রকার, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, সুন্নাতে যাইদাহ বা নফল।

নামায তরককারীর বিধান

কেউ যদি নামাযের বিধান অস্বীকারকরতঃ নামায তরক করে তবে সে কাফির হবে এবং ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি নামাযের ফরযিয়ত স্বীকারকরতঃ অলসতার কারণে নামায তরক করে

তবে সে কাফির নয়, বরং ফাসিক; তাকে তাওবাকরতঃ নামায আদায় করতে বলা হবে।

নামাযের ওয়াক্ত

দিন-রাতের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য রয়েছে নির্ধারিত সময়। নামাযকে নির্ধারিত সময়ে আদায় করা জরুরী। ওয়াক্তের আগে নামায পড়লে তা ছহী হবে না। পক্ষান্তরে ওয়াক্তের পরে কাযা করলে নামায তো হয়ে যাবে, কিন্তু বিনা ওযরে হলে গোনাহগার হবে। নীচে প্রত্যেক ফরয নামাযের রাকাত-সংখ্যা ও সময় উল্লেখ করা হলো।

১. ফজরের নামায দুই রাক'আত। ফজরের সময় শুরু হয় 'ফজরে ছাদিক' থেকে।[১] সূর্যোদয়ের মাধ্যমে ফজরের সময় শেষ হয়।

২. যোহরের নামায চার রাক'আত। সূর্য যখন মধ্য-আকাশ থেকে হেলে পড়ে তখন যোহরের সময় শুরু হয়। এবং 'মূল ছায়া'[২] বাদে প্রতিটি বস্তুর ছায়া যখন দ্বিগুণ হয়ে যায় তখন যোহরের সময় শেষ হয়। এটা আবু হানীফা (রহ) এর মত এবং পরবর্তী আলিমগণ এর উপরই ফতোয়া দিয়েছেন।

ছাহেবায়নের মতে যখন মূল ছায়া বাদে প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমগুণ হয়ে যায় তখন যোহরের সময় শেষ হয়।

৩. আছর হলো চার রাক'আত। ইমামদের নিজ নিজ মতে যখন যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয় তখন থেকে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের সময় তা শেষ হয়।

৪. মাগরিব হলো তিন রাক'আত। মাগরিবের সময় হলো সূর্যাস্তের পর থেকে الشَّفَقُ الأحمر (দিগন্ত লালিমা) অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত। এটা

---

১. পূর্বদিগন্তে প্রথমে লম্বালম্বি শুভ্র আলোকরশ্মি দেখা দেয়, তারপর আবার অন্ধকার হয়, এটাকে বলে 'ফজরে কাযিব'। এটা রাতের অংশ। তারপর প্রস্থে ফরসা দেখা দেয় এবং তা বাড়তেই থাকে। এটাকে বলে 'ফজরে ছাদিক'। দুই ফজরের মাঝে সময়ের ব্যবধান হলো বার মিনিট।

২. সূর্য ঠিক মধ্য-আকাশে থাকার সময় প্রতিটি বস্তুর যে ছায়া হয় সেটাকে বলে فَيْءُ الزَّوالِ বা মূল ছায়া।

ছাহেবায়নের মত, আর পরবর্তী আলিমগণ এর উপরই ফতোয়া দিয়েছেন। আবু হানিফা (রহ) এর মতে দিগন্ত লালিমা অস্ত যাওয়ার পর যে শুভ্রতা দেখা দেয় সেটা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময়।

৫. এশা চার রাক'আত। ইমামদের নিজ নিজ মতে মাগরিব যখন শেষ হয় তখন থেকে ফজরে ছাদিকের আগ পর্যন্ত হলো এশার সময়।

○ বিতিরের নামায ওয়াজিব। এশা ও বিতিরের সময় অভিন্ন, তবে এশার নামায আদায়ের পর বিতির আদায় করতে হয়। সুতরাং এশার আগে বিতির পড়া হলে এশার পর পুনরায় তা আদায় করা ওয়াজিব হবে।[১]

○ উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে সূর্য অস্ত যাওয়ার একটু পরেই সূর্য উঠে যায়, সেখানের বাসিন্দারা এশার নামায কাযা করবে। আর যে সকল মেরু অঞ্চলে ছয় মাস দিন, ছয় মাস রাত, সেখানে চব্বিশ ঘন্টা হিসাব করে নামায আদায় করবে।

কয়েকটি মাসআলা

১ – ওযরে, বিনা ওযরে কোনভাবেই দুই ফরয নামায এক ওয়াক্তে পড়া জায়েয নয়।

২ – শুধু হাজীগণ আরাফার ময়দানে ইমামের সঙ্গে যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আছর একত্রে পড়বেন। এবং মোযদালেফায় পৌঁছার পর ইমামের সঙ্গে মাগরিব ও এশা একত্রে পড়বেন।

৩ – তিন সময়ে ফরয, ওয়াজিব ও কাযা নামায আদায় করা জায়েয নয়। (ক) উদয়ের পর সূর্য উঁচু হওয়া পর্যন্ত। (খ) সূর্য মধ্য

---

১. أَوَّلُ وقتِ الفَجْرِ إذا طلَعَ الفجرُ الثانِيْ و آخِرُ وَقْتِها مَا لَمْ تطلُعِ الشمسُ و أولُ وقتِ الظهر مِنْ زَوالِ الشمسِ إلى أن يبلُغَ ظِلُّ الشيءِ مِثْلَيْهِ سِوى فَيْءِ الزَّوالِ وَ إذا خَرَجَ وقتُ الظهرِ دخَلَ وقتُ العصرِ، و آخِرُ وقتِها ما لم تَغْرُبِ الشمسُ، و إذا غابَتِ الشمسُ دخَل وقتُ المغربِ و يَبْقَيْ إلى أن يغيبَ الشفَق، و إذا خرَج وقتُ المغربِ دخلَ وقتُ العِشاء، و آخِرُ وقتِها ما لم يطلُعِ الفَجْرُ، و وقتُ الوِتْرِ وقتُ العِشاء بَعد أَداءِ العِشاء .

আকাশে থাকার সময় থেকে হেলে পড়া পর্যন্ত। (গ) সূর্য বিবর্ণ হওয়ার পর অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। (তবে সেদিনের আছর এ সময়ে পড়া যাবে।)

৪ – এ তিন সময়ে যা ওয়াজিব হবে তা তখন আদায় করা যাবে, তবে মাকরূহ হবে। যেমন, ঐ সময়গুলোতে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলো, বা জানাযা হাজির হলো তখন তিলাওয়াতের সিজদা করা এবং জানাযা পড়া মাকরূহ হবে, বরং উত্তম হলো বিলম্ব করে নিষিদ্ধ সময়ের পরে আদায় করা।

৫ – এ তিন সময়ে যে কোন নফল পড়া মাকরূহে তাহরীমী।

নামাযের মুস্তাহাব সময়।

১ – ফজরের নামাযে মুস্তাহাব হলো إسفار (ফরসা করে পড়া)।

২ – যোহরের নামায গরমকালে বিলম্বে এবং শীতকালে অবিলম্বে পড়া মুস্তাহাব। আর মেঘলা দিনে বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব, যাতে সূর্য হেলে পড়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।

৩ – সূর্যের বিবর্ণতার আগ পর্যন্ত আছর বিলম্বিত করা মুস্তাহাব।

৪ – মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। তবে আকাশ মেঘলা হলে একটু বিলম্ব করা মুস্তাহাব।

৫ – রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশা বিলম্বিত করা মুস্তাহাব।

০ যদি কেউ শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার বিষয়ে আশ্বস্ত থাকে তবে তার জন্য শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের পর বিতির আদায় করা মুস্তাহাব। যদি নিশ্চয়তা না থাকে তবে এশার পর বিতির পরে নেয়া উচিত।

নফল পড়ার মাকরূহ সময়

১ – ফজরের সময় শুরু হওয়ার পর (এ সময় ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ছাড়া অতিরিক্ত নফল পড়া মাকরূহ।)

২ – ফজরের ফরয পড়ার পর সূর্য উপরে ওঠা পর্যন্ত (অর্থাৎ সূর্য বেশ উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত।)

৩ – আছরের নামাযের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

৪ – জুমু'আর দিন খাতীব খোতবার জন্য বের হওয়ার পর থেকে ফরয শেষ করা পর্যন্ত।

৫ – ইকামাতের সময়। (তবে ইকামাতের সময় ফজরের সুন্নাত পড়া মাকরূহ নয়, বরং ইমামকে দ্বিতীয় রাক'আতে পাওয়া নিশ্চিত হলে কাতার থেকে আলাদা কোন স্থানে ফজরের সুন্নাত পড়ে নেবে।)

৬ – ঈদের নামাযের আগে ঘরে বা ঈদগায়, আর ঈদের নামাযের পর ঈদগায় নফল পড়া মাকরূহ। (ঈদের নামযের পর ঘরে নফল পড়া মাকরূহ নয়।)

৭ – ফরয নামাযের সময় যদি এতটা সংকীর্ণ হয় যে, নফল শুরু করলে ফরয ফাওত হওয়ার আশংকা আছে।

প্রশ্নমালা

১ – নামাযের ফযীলত এবং আমাদের করণীয় সম্পর্কে কিছু বলো।

২ – صلاة এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বলো।

৩ – নামাযের তিন প্রকার আলোচনা করো।

৪ – কারো উপর নামায ফরয হওয়ার শর্তাবলী আলোচনা করো।

৫ – ফজরের সময় কখন শুরু এবং কখন শেষ, বলো।

৬ – যোহরের ওয়াক্ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

৭ – মাগরিবের সময় আলোচনা করো।

৮– একই ওয়াক্তে দুই ফরয নামায আদায়ের হুকুম আলোচনা করো।

৯ – যোহরের শেষ ওয়াক্তে যোহর এবং আছরের প্রথম ওয়াক্তে আছর– এভাবে দুই ওয়াক্ত একত্র পড়ার হুকুম কী ?

১০ – কোন্ তিন সময়ে কোন্ কোন্ নামায পড়া নিষিদ্ধ?

১১ – কোন্ ওয়াক্তের নামায কখন পড়া মুস্তাহাব, আলোচনা করো।

১২ – কোন্ কোন্ সময়ে নফল পড়া মাকরূহ, আলোচনা করো।

নামাযের ফরয

০ فُروض الصلاةِ বলে ঐ সকল আমলকে যার একটি বাদ গেলেও নামায ছহী হয় না, বরং নামায বাতিল হয়ে যায়। فروض الصلاة দুই প্রকার। যে সকল ফরয, صلاة এর হাকীকতভুক্ত সেগুলোকে বলে أركان الصلاة। আর যে সকল ফরয, صلاة এর হাকীকতভুক্ত নয়, তবে صلاة ছহী হওয়ার জন্য অপরিহার্য সেগুলোকে شَرائِطُ الصلاةِ বলে।

০ নামাযের ফরয মোট এগারটি। তার মধ্যে শর্ত ছয়টি এবং রোকন পাঁচটি। নামাযের শর্ত ছয়টি এই–

১ – তাহারাত ২ – সতর ৩ – কিবলা ৪ – ওয়াক্ত ৫ – নিয়ত ৬ – তাহরীমা।

১. তাহারাত অর্থ– (ক) নামাযীর শরীর যাবতীয় নাজাসাত থেকে পাক হওয়া এবং বড় হাদাছ ও ছোট হাদাছ[১] থেকে পাক হওয়া। অর্থাৎ অযুর প্রয়োজন হলে অযু করে নেয়া এবং গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করে নেয়া।

(খ) কাপড় এবং নামাযের স্থান নাজাসাত থেকে পাক হওয়া। নামাযের স্থান মানে দু'পা, দু'হাত, দুই হাঁটু ও কপাল রাখার স্থান।

আর নাজাসাত অর্থ ঐ পরিমাণ নাজাসাত যা শরীয়ত মাফ করে না।

২. সতর ঢাকতে সক্ষম অবস্থায় বেলা-সতর নামায ছহী নয়। আর নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সতর ঢাকা ফরয।[২]

০ নামাযের আগে থেকেই যদি কোন অঙ্গের চারভাগের একভাগ খোলা থাকে তবে নামায শুরুই হবে না। আর যদি নামাযের মাঝে ঐ পরিমাণ সতর খুলে যায় এবং এক রোকন পরিমাণ সময় খোলা থাকে তাহলে নামায ভেঙ্গে যাবে। এক রোকন পরিমাণ অর্থ তিন তাসবীহ পড়ার সময়।

---

১. الحَدَثُ الأكبرُ و الحدثُ الأصْغرُ

২. لا تَصِحُّ الصلاةُ بِدُونِ سَتْرِ العَوْرَةِ عندَ القُدرةِ على سَتْرِها، ويَلْزَمُ السَّتْرُ مِنْ أَوَّلِ الصلاة إلى آخِرِها ·

এটা হলো নিজে নিজে সতর খুলে যাওয়ার বিধান। পক্ষান্তরে নামাযী নিজে যদি সতর খুলে ফেলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

০ পুরুষের সতরের সীমানা হলো নাভী থেকে হাঁটুর শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ নাভী সতরভুক্ত নয়, তবে হাঁটু সতরভুক্ত।[১]

স্ত্রীলোকের সতর হলো চেহারা, দুই হাতের কব্জি ও পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর।[২]

৩. কিবলামুখী হতে সক্ষম অবস্থায় কিবলামুখী হওয়া ছাড়া নামায ছহী হবে না।[৩]

০ সরাসরি কাবা দেখা গেলে স্বয়ং কাবা-ই হবে কিবলা। সুতরাং সোজা কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে। পক্ষান্তরে সরাসরি কাবা দেখা না গেলে কাবার দিক হলো কিবলা।[৪] সুতরাং কাবার দিকে মুখে করে দাঁড়ানোই যথেষ্ট হবে। সোজা কাবামুখী হওয়া জরুরী নয়।

অসুস্থতার কারণে বা শত্রুর ভয়ে কিবলামুখী হতে না পারলে যে দিকে সম্ভব মুখ করে নামায পড়ে নেবে।

৪. নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামায পড়া ছহী নয়। (নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।)

৫. নিয়ত ছাড়া নামায ছহী নয়। কোন্ ওয়াক্তের ফরয নামায তাও নিয়ত করতে হবে, যেমন– যোহর কিংবা আছর। তদ্রূপ কোন্ ওয়াজিব নামায তাও নিয়ত করতে হবে, যেমন– বিত্‌রি বা ঈদের নামায। নফলের ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ত জরুরী নয়, শুধু নফল নামাযের কিংবা শুধু নামাযের নিয়ত করাই যথেষ্ট।

০ মুক্‌তাদীকে ইমামের পিছনে ইক্‌তিদা করারও নিয়ত করতে হবে।

৬. তাহরীমা অর্থ– الله أكبر বলে নামায শুরু করা। নিয়ত ও

---

১. وَ عَوْرَةُ الرَّجُلِ ما تَحتَ السُّرَّةِ إلى الرُّكْبَةِ و الركبةُ عَوْرَةٌ دُوْنَ السُّرَّةِ

২. وَ بَدَنُ المرأةِ الحُرَّةِ كُلُّه عَورةٌ سِوَى الوجهِ و الكَفَّيْنِ و القَدَمَيْنِ

৩. لا تَصِحُّ الصلاةُ بِدُونِ اسْتِقبالِ القِبْلَةِ عِنْدَ القُدرَةِ على اسْتِقبالِها

৪. وَ عَيْنُ الكَعْبَةِ قِبْلَةٌ لِمَنْ شاهَدَها، وَ جِهَةُ الكعبَةِ قبلَةٌ لِمَنْ لَمْ يُشاهِدْها

তাকবীরে তাহরীমা-এর মাঝে নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ করা যাবে না। যেমন পানাহার বা কথা-বার্তা।

০ তাহরীমার তাকবীর দাঁড়ানো অবস্থায় বলা জরুরী। আর তাহরীমার পরে নিয়ত করা গ্রহণযোগ্য নয়, বরং তাহরীমার আগে বা সঙ্গে নিয়ত করতে হবে।

তাকবীরের উচ্চারণ এমন হতে হবে যা নিজের কানে শোনা যায়।

কয়েকটি মাসআলা

১ – নাজাসাত দূর করার মত কিছু না পাওয়া গেলে নাজাসাতসহই নামায পড়বে, আর পরে তা দোহরাতে হবে না।[১]

২ – তোষক, কম্বল ও তেরপালজাতীয় মোটা কাপড়ের একপিঠে যদি নাজাসাত থাকে, আর নাজাসাতের আর্দ্রতা অন্য পিঠে দেখা না দেয় তাহলে অন্য পিঠে নামায পড়া যাবে।

৩ – শুকনো নাজাসাতের উপর যদি এমন পাতলা কাপড় বিছানো হয় যে, নাজাসাত দেখা যায় বা তার গন্ধ আসে তাহলে নামায হবে না। আর যদি মোটা কাপড় হয়, যাতে নাজাসাত দেখা যায় না (এবং তেমন গন্ধ আসে না তাহলে নামায ছহী হবে।

৪ – সতর ঢাকার মত কাপড় বা ঘাস-পাতা কিংবা কাদামাটি যদি না পায় তাহলে বেলা-সতর নামায পড়বে, আর পরে তা দোহরাতে হবে না।

৫ – কাপড়ের চারভাগের একভাগ পাক হলে বেলা-সতর নামায ছহী হবে না। এমনকি নাপাক কাপড়ের নামায বেলা-সতর নামায থেকে উত্তম।

৬ – উলঙ্গ ব্যক্তি কিবলার দিকে পা লম্বা করে বসে নামায পড়বে এবং ইশারায় রুকূ-সিজদা আদায় করবে।

৭ – নাজাসাতযুক্ত কাপড় যদি এত বড় হয় যে, একপ্রান্ত ধরে নাড়া

---

১. وَمَنْ لم يجِدْ ما يُزِيل به النجاسةَ صلّى مَعها و لم يُعِدِ الصلاةَ

দিলে অপর প্রান্তে নাড়া পড়ে না তাহলে ঐ কাপড়ের পাক প্রান্তে দাঁড়িয়ে বা শরীরে জড়িয়ে নামায পড়া যাবে।

৮ – কেবলার দিক জানা না থাকলে এবং জানার মত কোন মানুষ বা কোন চিহ্ন পাওয়া না গেলে চিন্তা-ভাবনা করে কিবলার দিক নির্ধারণ করবে এবং ঐ দিকে মুখ করে নামায পড়বে। এটাকে বলে تَحَرِّى الْقِبْلَةِ এক্ষেত্রে দিক ভুল হলেও নামায হয়ে যাবে। আর যদি নামাযের অবস্থায় ভুল ধরা পড়ে তাহলে তখনই কিবলার দিকে ঘুরে যাবে এবং অবশিষ্ট নামায পড়ে নেবে।[১]

৯ – যদি বিভিন্ন অঙ্গে সামান্য সামান্য সতর দেখা যায়, আর সব মিলিয়ে 'সতর নষ্ট' অঙ্গগুলোর সবচেয়ে ছোটটির চারভাগের একভাগ হয়ে যায় তাহলে নামায বাতিল হয়ে যাবে, আর চারভাগের একভাগের কম হলে নামায হয়ে যাবে।

প্রশ্নমালা

১ – شرائط الصلاة ও أركان الصلاة কে সম্মিলিতভাবে কী বলে এবং فروض الصلاة কয়টি?

২ – شرائط الصلاة ও أركان الصلاة এর মাঝে অভিন্ন দিক কী এবং ভিন্ন দিক কী বলো।

৩ – নামাযের ছয়টি শর্ত কী কী? এবং কোন্ কোন্ শর্ত অপারগতার অবস্থায় মাফ হয়ে যায়।

৪ – কখন বেলা-সতর নামায পড়ার চেয়ে কাপড় পরে নেয়া উত্তম?

৫ – নামাযের জন্য কী কী পাক হওয়া শর্ত, বিস্তারিত বলো।

৬ – সতর খোলা অবস্থায় কেউ তাকবীরে তাহরীমা বললো, আর সঙ্গে সঙ্গে একজন তার সতর ঢেকে দিলো, এই নামাযের কী হুকুম।

---

১. إِنِ اشْتَبَهَتْ عليه القبلةُ و ليس بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عنها اجْتَهَدَ و صلّى، فَإِنْ عَلِمَ بَعد ما صلّى أَنَّهُ قد أَخْطَأَ فلا إعادةَ عليه، وَإِنْ عَلِمَ ذلك في الصلاةِ اسْتَدَارَ إلى القبلَةِ و بَنَى عليها .

৭ – নাজাসাতের উপর জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়ার কী হুকুম?

৮ – ওযরের কারণে কিংবা কিবলার দিক না জানার কারণে কিবলামুখী হতে না পারলে কী করণীয়?

৯ – ফরয, ওয়াজিব এবং নফল নামাযে কী কী নিয়ত করতে হবে এবং মুক্‌তাদীকে আলাদাভাবে কী নিয়ত করতে হবে?

১০ – উলঙ্গতার ওযর হলে কীভাবে নামায পড়বে ?

নামাযের আরকান

নামাযের আরকান পাঁচটি। ১. কিয়াম ২. ক্বিরাআত ৩. রুকূ ৪. সিজদা ৫. তাশাহহুদ-পরিমাণ শেষ বৈঠক।

এই পাঁচ রোকনের কোন একটি ভুলে বা ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

১. কিয়ামে সক্ষম অবস্থায় কিয়াম ছাড়া নামায ছহী নয়। তবে শুধু পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায এবং ওয়াজিব নামাযের ক্ষেত্রে কিয়াম ফরয, নফল নামাযে কিয়াম ফরয নয়। সুতরাং বিনা ওযরেও বসে নফল পড়া যায়।

২. ফরযের দুই রাক'আতে এবং ওয়াজিব ও নফলের সকল রাক'আতে ক্বিরাআত ফরয। সুতরাং অন্তত একটি ছোট আয়াতের ক্বিরাআত ছাড়া নামায ছহী হবে না।

তবে মুক্‌তাদীর কোন ক্বিরাআত নেই, বরং তার জন্য ক্বিরাআত পড়া মাকরূহ।

৩ ও ৪. প্রতি রাক'আতে একটি রুকূ ও দু'টি সিজদা ছাড়া নামায ছহী হবে না। মাথা ও শরীর সামান্য ঝুঁকানোই হলো রুকূর ফরয, তবে রুকূ পূর্ণ হবে মেরুদণ্ড বাঁকা করে পিঠ বিছিয়ে নিতম্ব ও মাথা সমান করার পর।

০ সিজদার ফরয আদায় হয়ে যায় কপালের কোন অংশ, এক হাত, এক হাঁটু এবং এক পায়ের কোন আঙ্গুল মাটিতে লাগানোর মাধ্যমে। তা

সিজদা পূর্ণ হবে দু'হাত, দু'হাঁটু, দু'পায়ের পাতা এবং কপাল ও নাক মাটিতে রাখার পর।

০ এমন শক্ত কিছুর উপর সিজদা দিতে হবে যাতে অতিরিক্ত চাপ দিলেও কপাল প্রথম রাখার সময় থেকে বেশী ডেবে না যায়। নচেৎ সিজদা ছহী হবে না।

০ ওযর ছাড়া শুধু নাকের উপর সিজদা করা ছহী নয়।

০ পায়ের স্থান থেকে আধা হাত উঁচুতে কপাল রেখে সিজদা করলে তা ছহী হবে না। অবশ্য প্রচণ্ড ভিড়ের সময় ছহী হবে।

০ হাতের পিঠের উপর বা পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্তের উপর সিজদা করা মাকরূহ।

৫. তাশাহহুদ পরিমাণ শেষ বৈঠক ফরয, তবে তাশাহহুদ পড়া ফরয নয়। কারো কারো মতে একটি 'কর্ম' দ্বারা নামায থেকে বের হওয়া ফরয। কিন্তু বিশুদ্ধ মতে শেষ বৈঠকের পর এমনিতেই নামায শেষ হয়ে যায়। কোন 'কর্ম' দ্বারা নামায থেকে বের হওয়া ফরয নয়, বরং তা ওয়াজিব।[১]

প্রশ্নমালা

১ – ফজরের ও ইশরাকের দু'রাক'আত বসে পড়ার হুকুম কী?

২ – নামাযে ক্বিরাআত পড়া তো ফরয, কিন্তু কেউ যদি ভুলে ফাতিহা না পড়ে তাহলে কি নামায ছহী হবে?

৩ – রুকূ ও সিজদার 'আদনা' পরিমাণ এবং পূর্ণ পরিমাণ কী?

৪ – কিয়ামের চেয়ে সিজদার স্থান উঁচু হলে কি সিজদা ছহী হবে?

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

নামাযের কোন ওয়াজিব আমল ভুলে তরক করলে নামায অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং সাহুর সিজদা ওয়াজিব হবে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে তরক করলে নামাযই দোহরাতে হবে, অন্যথায় সে গোনাহগার হবে। নামাযের ওয়াজিবসমূহ এই–

---

١. قَدْ عَدَّ بعضُ الفُقَهاء خُروجَ المصلِّي مِنَ الصلاةِ بِصَنْعِه فَرْضاً، و الصحيحُ أنه واجِبٌ
الفقهاء

১ – الله أكبر বলে নামায শুরু করা।

২ – ফরয নামাযের প্রথম দু'রাক'আতে এবং বিতির ও নফলের সব রাক'আতে সূরাতুল ফাতিহা পড়া।

৩ – সূরাতুল ফাতিহার সঙ্গে ছোট কোন সূরা বা ছোট ছোট তিনটি আয়াত পড়া।

৪ – আগে সূরাতুল ফাতিহা এবং পরে অন্য সূরা বা আয়াত পড়া।

৫ – পর পর দুই সিজদা করা।

৬ – সমস্ত রোকন ধীর-স্থির ও প্রশান্তভাবে আদায় করা।

৭ – দুই রাক'আতের পর তাশাহহুদ পরিমাণ প্রথম বৈঠক করা।

৮ – প্রথম বৈঠকে এবং শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।

৯ – তাশাহহুদের পর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ানো।

১০– দু'বার السلام عليكم و رحمة الله বলে নামায থেকে বের হওয়া।

১১ – বিতিরের তৃতীয় রাক'আতে ফাতিহা ও সূরার পর কুনূত পড়া।

১২ – দুই ঈদের নামাযে প্রতি রাক'আতে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলা এবং দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূর তাকবীর বলা।

১৩ – ফজর, জুমু'আ, তারাবীহ ও দুই ঈদের নামাযে এবং মাগরিব, এশা ও রামাযানে বিতিরের প্রথম দুই রাক'আতে ইমামের সশব্দে ক্বিরাআত পড়া।

মুনফারিদের জন্য জাহরী নামাযে সশব্দে ক্বিরাআত পড়াই উত্তম, তবে নিঃশব্দেও পড়া যায়।

১৪ – যোহর ও আছরের সব রাক'আতে, মাগরিবের তৃতীয় রাক'আতে এবং এশার শেষ দুই রাক'আতে ইমাম ও মুনফারিদ উভয়ের জন্য নিঃশব্দে ক্বিরাআত পড়া

কয়েকটি মাসআলা

১ – প্রথম সিজদার পর দ্বিতীয় সিজদা ভুলে নামাযের অন্য আমল শুরু করলে যখন মনে পড়বে তখন ছুটে যাওয়া সিজদা আদায় করবে এবং তারতীব ভঙ্গের কারণে সাহু সিজদা দেবে।

২ – দিনের নফল নামাযে ক্বিরাআত নিঃশব্দে পড়া ওয়াজিব।

৩ – এশার প্রথম দু'রাক'আতে সূরা মিলানো ভুলে গেলে শেষ দু' রাক'আতে ফাতিহার সঙ্গে সশব্দে সূরা পড়ে নেবে এবং সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে।

৪ – প্রথম দু'রাক'আতে ফাতিহা ভুলে গেলে শেষ দু'রাক'আতে ফাতিহা দোহরাবে না, বরং সাহু সিজদা করা ওয়াজিব হবে।[১]

৫ – ঈদের ছয় তাকবীরের প্রতিটি তাকবীর আলাদা ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূর তাকবীরও আলাদা ওয়াজিব।

৬ – প্রতিটি ফরয বা ওয়াজিবকে বিলম্ব ছাড়া আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং যদি ক্বিরাআত পড়ার পর ভুলে অন্য চিন্তায় মগ্ন হয়ে তিন তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করে ফেলে, তারপর রুকূতে যায় তাহলে ফরযে বিলম্বের কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে।

তদ্রূপ বৈঠকে বসে যদি ভুলে গিয়ে তাশাহহুদ শুরু করতে তিন তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করে তবে ওয়াজিবকে বিলম্বিত করার কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে।

প্রশ্নমালা

১ – নামাযের কোন ওয়াজিব তরক করার হুকুম বলো।

২ – চার রাকাতী নামাযের দুই বৈঠকের মাঝে পার্থক্য কী?

৩ – কোন্ কোন্ রাক'আতে সূরাতুল ফাতিহা পড়া ওয়াজিব?

৪ – ইমাম ও মুনফারিদ এশার প্রথম রাক'আতে নিঃশব্দে ফাতিহা পড়েছে, এখন কী করণীয় এবং কেন?

৫ – প্রথম বা তৃতীয় রাক'আতের পর মুছল্লী সন্দেহে পড়ে গেলো এবং কিছু সময় চিন্তা করে দ্বিতীয় বা চতুর্থ রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলো, এখন কী করণীয় এবং কেন?

৬ – ভুলে প্রথম বা তৃতীয় রাক'আতের পর বৈঠকে বসে মনে পড়লো

---

১. مَنْ تَرَكَ الفاتِحَةَ في الأُولَيَيْنِ لا يُكَرِّرُها في الأُخْرَيَيْنِ، بل يسجُد للسَّهْوِ

যে, সে তো দ্বিতীয় বা চতুর্থ রাক'আতের আগেই বৈঠক করে ফেলেছে, এখন তার কী করণীয় এবং কেন?

৭ – এক মুছল্লী প্রথম বা দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআত পড়া ভুলে গেলো, বা ইচ্ছা করে ক্বিরাআত ছেড়ে দিলো। আরেক মুছল্লী ফাতিহা পড়া ভুলে গেলো বা ইচ্ছা করে ফাতিহা ছেড়ে দিলো। আরেক মুছল্লী সূরা মিলানো ভুলে গেলো বা ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলো; এখন কার নামাযের কী হুকুম, বলো।

নামাযের সুন্নাতসমূহ

ভুলে বা ইচ্ছা করে কোন সুন্নাত ছেড়ে দিলে নামায ভঙ্গ হয় না এবং সাহু সিজদাও ওয়াজিব হয় না, তবে নামায অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং নামায যেন পূর্ণাঙ্গ হয় সে জন্য নামাযের সুন্নাতগুলো যত্নের সঙ্গে আদায় করা উচিত। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

صَلُّوا كما رَأَيتُموني أُصَلِّي

"তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছো সেভাবে নামায পড়ো।"

নামাযের সুন্নাতগুলো এই –

১ – তাহরীমার পূর্বমুহূর্তে ছেলেদের দুই হাত কান বরাবর এবং মেয়েদের দুই হাত কাঁধ বরাবর তোলা।

২ – হাতের তালু ও আঙ্গুল কিবলামুখী রাখা এবং আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রাখা। একেবারে মিলিয়ে রাখবে না, আবার বেশী ফাঁক করে রাখবে না।

৩ – নাভির নীচে বাম হাতের পাতার উপর ডান হাতের পাতা রাখা এবং ছোট আঙ্গুল ও বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা বাম হাতের কব্জি বেষ্টন করা।

৪ – হাত বাঁধার পর ثناء ও تعوذ পড়া।

৫ – প্রত্যেক রাক'আতে ফাতিহার পূর্বে بسم الله الرحمن الرحيم পড়া এবং ফাতিহার পরে آمين বলা।

৬ – কিয়ামের অবস্থায় দুই পায়ের পাতা সোজা কিবলামুখী করে মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা এবং শরীর ও মাথা সোজা রাখা।

৭ – যোহরে ও ফজরে ফাতিহার পর طِوَالِ مُفَصَّلْ [১] এবং আছরে ও এশায় أَوْسَاطِ مُفَصَل [২] এবং মাগরিবে قِصَارِ مفصل [৩] এর কোন সূরা পড়া।

৮ – শুধু ফজরে প্রথম রাক'আতকে দ্বিতীয়টির চেয়ে লম্বা করা।

৯ – রুকূ-সিজদার এবং ওঠা-বসার তাকবীর বলা। (তবে রুকূ থেকে ওঠার সময় ইমাম سمع الله لمن حمده এবং মুক্তাদী আস্তে ربنا و لك الحمد। আর মুনফারিদ দু'টোই বলবে।)

১০ – রুকূতে আঙ্গুল ফাঁক রেখে দুই হাঁটু ধরা এবং পিঠ বিছিয়ে মাথা ও নিতম্ব সমান রাখা এবং হাঁটু না ভেঙ্গে সোজা রাখা এবং পার্শ্ব থেকে উভয় হাত দূরে রাখা।

১১ – রুকূতে ও সিজদায় আস্তে অন্তত তিনবার তাসবীহ পড়া

১২ – সিজদায় আগে দুই হাঁটু, তারপর দুই হাত, তারপর চেহারা রাখা এবং ওঠার সময় আগে চেহারা, তারপর দুই হাত, তারপর দুই হাঁটু তোলা।

১৩ – সিজদায় পেটকে ঊরু থেকে এবং দুই কনুইকে পার্শ্ব থেকে দূরে রাখা এবং হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখা এবং পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী রাখা।

১৪ – তাকবীর বলে, না বসে এবং যমীনের উপর হাতে ভর না দিয়ে সিজদা থেকে সোজা উঠে দাঁড়ানো। (ওযর থাকলে ভিন্ন কথা।)

১৫ – তাশাহহুদের বৈঠকে এবং দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখা এবং বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং দুই হাত দুই ঊরুর উপর রাখা।

---

١. و هي من سورة الحُجُرات إلى سورة البُروج

٢. وَ هي بَعد البُروجِ إلى لم يكن الذين

١. و هي بَعد لم يكن الذين إلى سُورة الناس

১৬ – তাশাহহুদে إلـه لا বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করা এবং إلا الله বলার সময় আঙ্গুল নামানো।

১৭ – দু'রাক'আতের পরবর্তী রাক'আতগুলোতে ফাতিহা পড়া।

১৮ – শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দুরূদ পড়া, তারপর নিজের জন্য দু'আ মাছুরা পড়া।[২] একটি দু'আ মাছুরা এই –

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا و لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، و ارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم .

১৯ – ইমামের সালাম ও তাকবীর সশব্দে বলা এবং মুক্তাদীর আস্তে বলা।

২০ – আগে ডানে ও পরে বামে মুখ ফিরিয়ে সালাম বলা এবং প্রথম সালামের তুলনায় দ্বিতীয় সালাম একটু আস্তে বলা।

২১ – মুক্তাদীর সালাম ইমামের সালামের সঙ্গে হওয়া।

২২ – মসবূকের জন্য ইমামের দুই সালাম শেষ হওয়ার পর ওঠা।

কয়েকটি মাসআলা

১ – সালামের সময় ইমাম মুছল্লীদের নিয়ত করবে এবং হেফাযত-কারী ফিরেশতাদের এবং নেককার জ্বিনদের নিয়ত করবে। আর মুক্তাদী ইমামের দিকের সালামে ইমামেরও নিয়ত করবে। আর মুনফারিদ শুধু ফিরেশতাদের নিয়ত করবে।

২ – শাহাদাতের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার সময় বুড়ো আঙ্গুল ও মাঝের আঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত তৈরী করবে, বাকী দুই আঙ্গুল গোল করে মিলিয়ে রাখবে। শাহাদাতের আঙ্গুল নামানোর পর সব আঙ্গুল আগের মত সোজা করে ফেলবে।

৩ – দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে মাগফেরাতের দু'আ করবে। যেমন– الهم اغفر لي و ارحمني و عافِني و اهدني و ارزقني

২. الأَدْعِيَةُ المأثورَةُ - الدُّعاء المَأثُور হাদীছে বর্ণিত দু'আ।

৪ – তুমি যদি দুই সিজদার মাঝের বৈঠক ছেড়ে দাও এবং মাথা সামান্য তুলে দ্বিতীয় সিজদায় চলে যাও তাহলে দ্বিতীয় সিজদা হলো না। আর যদি বসার কাছাকাছি এসে দ্বিতীয় সিজদায় যাও তাহলে সিজদা হয়ে যাবে, তবে মাকরূহে তাহরীমী হবে।

নামাযের মুস্তাহাবসমূহ

নামাযের মুস্তাহাবগুলো ঠিক মত আদায় করা দরকার, যাতে নামায সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। নামাযের মুস্তাহাবগুলো এই –

১ – কিয়ামের সময় সিজদার স্থানে, রুকূর সময় দু'পায়ের মাঝে, সিজদার সময় নাকের ডগায়, বৈঠকের সময় কোলের দিকে এবং সালামের সময় কাঁধের দিকে নযর রাখা

২ – যথাসম্ভব হাঁচি ও হাই রোধ করা

৩ – ছেলেদের জন্য তাহরীমার সময় হাত কাপড়ের বাইরে আনা। (মেয়েরা হাত কাপড় থেকে বের করবে না।)

৪ – হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তাশাহহুদ পড়া।

৫ – বিতিরে শুধু .... اللهم إنا نستعينك এই কুনূত পড়া।

প্রশ্নমালা

১ – নামাযের সুন্নাত ও মুস্তাহাব তরক করার হুকুম কী?

২ – তাহরীমার সুন্নাত তরীকা বলো।

৩ – সিজদার যাবতীয় সুন্নাত বলো।

৪ – أعوذ بالله ও بسم الله পড়া সুন্নাত, কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য কী?

৫ – বৈঠকে বসার সুন্নাত তরীকা বলো।

৬ – মসবূক বাকী নামায পড়ার জন্য কখন ওঠবে?

৭ – শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারা সুন্নাত না মুস্তাহাব? এর তরীকা কী?

৮ – সালাম ফেরানোর সুন্নাত তরীকা বলো।

৯ – কখন কোথায় নযর রাখা উচিত এবং এটা সুন্নাত না মুস্তাহাব?

নামায ভঙ্গের কারণসমূহ

১ – নামাযের কোন রোকন ছেড়ে দেওয়া।

২ – নামাযের মাঝে শব্দ করে হাসা ও কথা বলা এবং খাওয়া ও পান করা। (যত সামান্য হোক এবং ইচ্ছায় বা ভুলে হোক।)

২ – নামাযের মধ্যে আমলে কাছীর করা।[১]

৩ – বিনা প্রয়োজনে কাশি দেয়া।

৪ – ব্যথায় বা বিপদে অস্থির হয়ে উহ আহ শব্দ করা, কিংবা শব্দ করে কাঁদা। (আল্লাহর ভয়ে বা জান্নাত-জাহান্নামের স্মরণে হলে নামায ভঙ্গ হবে না। তদ্রূপ অসুস্থ ব্যক্তি যদি কাতর ধ্বনি রোধ করতে না পারে তবে নামায ভঙ্গ হবে না।)

৫ – কিবলা থেকে বুক সরে যাওয়া

৬ – নামাযের মাঝে এক রোকন সময় পর্যন্ত সতর খোলা থাকা, কিংবা শরীরে, কাপড়ে বা নামাযের স্থানে নাজাসত লেগে থাকা।

৭ – নামাযের মাঝে নিজের দ্বারা বা অন্যের দ্বারা হাদাছগ্রস্ত হওয়া।

৮ – নামাযের মাঝে পাগল বা বেহুঁশ হয়ে যাওয়া।

৯ – ফজরের নামাযে সূর্য উঠে যাওয়া, ঈদের নামাযে যাওয়ালের সময় হয়ে যাওয়া এবং জুমু'আর নামাযে আছরের সময় হয়ে যাওয়া।

১০ – তায়াম্মুমকারীর পানি পাওয়া এবং পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া।

১১ – নামাযের মাঝে সালাম দেয়া বা সালামের জওয়াব দেয়া বা মোছাফাহা করা। তবে ইশারায় সালামের জওয়াব দিলে নামায ভঙ্গ হবে না।

১২ – ইমামের আগে মুক্তাদীর কোন রোকনে চলে যাওয়া এবং ইমামের সঙ্গে তাতে শরীক না হওয়া। (যেমন, আগে রুকূতে গেলো এবং ইমামের রুকূতে যাওয়ার আগে মাথা তুলে ফেলল এবং

---

১. العَمَلُ الكَثِيرُ أن يَغلِبَ على ظَنِّ النَّاظِرِ إليه أنَّه ليسَ في الصلاةِ

আবার রুকূতে গিয়ে ইমামের সঙ্গে শরীক হলো না।)

১৩ – ঘুমের অবস্থায় কোন রোকন আদায় করা এবং সজাগ হওয়ার পর ঐ রোকন না দোহরানো।

কয়েকটি মাসআলা

১ – নামাযের মধ্যে মানবীয় কোন দু'আ করলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। মানবীয় দু'আ অর্থ এমন দু'আ যা কোরআনে বা সুন্নায় নেই এবং যা মানুষের কাছে চাওয়া অসম্ভব নয়। যেমন–

اللهم أطعِمْني كذا أو ألبِسْني كذا أو أعطِني نُقودًا

যদি কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে এমন কোন কথা বলে যা মানবীয় কালাম নয়, বরং নামাযের উপযোগী কালাম, তবু নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। যেমন সুসংবাদ শুনে বললো الحمد لله এবং আশ্চর্যের কিছু শুনে বললো سبحان الله এবং মন্দ খবর শুনে বললো لا حول و لا قوة إلا بالله কিংবা হাঁচির জওয়াবে বললো يرحمك الله ইত্যাদি।

২ – আমলে কাছীর নামাযকে ফাসিদ করে দেয়। আমলে কাছীর মানে এমন কাজ, যা করা অবস্থায় দেখলে মনে হয় যে, লোকটি নামাযে নেই, আর যদি নামাযে আছে কি নেই তা নিয়ে সন্দেহ হয় তাহলে তা আমলে কাছীর নয়, বরং আমলে কালীল। তবে কোন আমলে কালীল লাগাতার তিনবার হলে তা আমলে কাছীর হয়ে যায়।

৩ – বাইরে থেকে মুখে নিয়ে কিছু খেলে বা পান করলে যত অল্পই হোক তাতে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। আর যদি দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবার গিলে ফেলে এবং পরিমাণে তা চনা বুটের চেয়ে কম হয় তাহলে নামায ফাসিদ হবে না। চনা বুটের সমান বা বেশী হলে ফাসিদ হবে।

৪ – যদি নিজে নিজে হাদাছ হয়ে যায়, যেমন পেশাবের ফোঁটা বের হলো বা নাক থেকে রক্ত ঝরলো, তাতে শুধু অযু ভঙ্গ হবে। সুতরাং সাথে সাথে অযু করে এসে আগের নামাযের উপর

ভিত্তি করে অবশিষ্ট নামায পড়তে পারে। এটাকে বলে بِنَاءُ الصلاة (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।)[১]

যদি নিজে হাদাছ সৃষ্টি করে,[২] কিংবা যদি অন্যের দ্বারা হাদাছ সৃষ্টি হয়,[৩] তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৫ – নিজে নিজে সতর খুলে গেলে এক রোকন সময় পর্যন্ত তা মাফ, কিন্তু নিজে বা অন্য কেউ খুলে ফেললে তখনি নামায ভেঙ্গে যাবে।

রোকন আদায় পরিমাণ সময় অর্থ, তিন তাসবীহ পরিমাণ সময়।

৬ – মুছল্লীর زَلَّةُ القِرَاءَةِ দ্বারা নামায ফাসিদ হয়ে যায়। زلة القراءة অর্থ উচ্চারিত শব্দ দ্বারা এমন অর্থ-পরিবর্তন ঘটা যা বিশ্বাস করা কুফুরি, তবে إعراب এর ভুলে কোন অবস্থাতেই নামায ফাসিদ হবে না। কেননা إعراب খেয়াল রাখা খুব কঠিন।

প্রশ্নমালা

১ – এক ব্যক্তি মুখ হা করার পর তার অনিচ্ছায় বৃষ্টির ফোঁটা মুখে চলে গেলো, আরেক ব্যক্তির মুখে জোর করে এক ফোঁটা পানি ঢুকিয়ে দেয়া হলো, আরেক ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে স্বেচ্ছায় এক ফোঁটা পানি পান করলো, আরেক ব্যক্তি নামাযের কথা স্মরণে থাকা অবস্থায় স্বেচ্ছায় এক ফোঁটা পানি পান করলো, এদের কার নামাযের কী হুকুম বলো।

২ – নামাযের মধ্যে إنا لله و إنا إليه راجعون বলার কী হুকুম?

৩ – নামাযের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যথায় অসহ্য হয়ে নিজের অজ্ঞাতে কাতর ধ্বনি করলো বা কাঁদলো, এর কী হুকুম?

৪ – কোন্ কান্নায় নামায ভাঙ্গে এবং কোন্ কান্নায় ভাঙ্গে না, বলো।

৫ – আমলে কাছীর ও আমলে কালীল ব্যাখ্যা করো।

---

১. إذا سَبَقَه الحَدَثُ من غَيْرِ عَمَدٍ فلا تَفْسَدُ صلاتُه، بل يَتَوَضَّأ و يَبْنِي على صَلاتِه

২. যেমন ইচ্ছা করে পেশাব করলো। ৩. যেমন কারো ছোঁড়া পাথরে জখম হলো এবং রক্ত ঝরলো, বা কেউ তার শরীরে সুঁই ঢুকিয়ে রক্ত বের করলো)

৬ – একজন একই রোকনে তিন বার মাথা চুলকালো, অন্যজন তিন রোকনে তিনবার চুলকালো, কার নামাযের কী হুকুম, বলো।

৭ – দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা চনা বুটের কম খাদ্য চিবিয়ে খাওয়া এবং গিলে খাওয়ার মাঝে পার্থক্য কী?

৮ – بناء الصلاة কাকে বলে?

৯ – যোহর পড়া অবস্থায় আছরের সময় হয়ে গেলে কী হুকুম?

১০ – ইমামের আগে মুক্‌তাদী সিজদায় চলে যাওয়ার কী হুকুম?

নামাযের মাকরূহসমূহ

তুমি যদি নামাযকে ত্রুটিমুক্ত করতে চাও তাহলে নামাযের সমস্ত মাকরূহ কাজ থেকে তোমাকে বিরত থাকতে হবে। নচেৎ তোমার নামায অপূর্ণাঙ্গ ও অসুন্দর থেকে যাবে। নামাযের মাকরূহগুলি এই–

১ – কাপড় নিয়ে বা শরীরের কোন অঙ্গ নিয়ে খেলা করা।

২ – ভদ্রসমাজে যাওয়া যায় না এমন বাজে কাপড়ে নামায পড়া এবং প্রাণীর ছবিওয়ালা কাপড়ে নামায পড়া।

৩ – আস্তিন গুটিয়ে রাখা এবং নষ্ট হবে বলে কাপড় গুটিয়ে রাখা।

৪ – মাথায় বা কাঁধে চাদর বা রুমাল ঝুলিয়ে রাখা।

৫ – তুচ্ছ স্থানে, রাস্তায় ও কবরস্তানে নামায পড়া।

৬ – কারো জায়গায় তার সম্মতি ছাড়া নামায পড়া।

৭ – বিনা ওযরে শুধু লুঙ্গি বা পায়জামা পরে নামায পড়া।

৮ – বিনা ওযরে বা বিনা প্রয়োজনে খোলা মাথায় নামায পড়া।

৯ – বিনা ওযরে 'মাফ পরিমাণ' نجاسة সহ নামায পড়া।

১০ – হাত যথাস্থানে যথানিয়মে না রাখা।

১১ – সামনে বা উপরে বা পিছনে ছবি থাকা অবস্থায় নামায পড়া।

১২– বিনা প্রয়োজনে ঘাড় ফিরিয়ে ডানে বামে এবং উপরে তাকানো।

১৩ – বিনা প্রয়োজনে চোখ বন্ধ রাখা।

১৪ – আঙ্গুল মটকানো এবং দু'হাতের আঙ্গুল জড়ানো।

১৫ – সিজদায় বৈঠকে হাত-পায়ের আঙ্গুল এবং অন্যান্য সময় পায়ের আঙ্গুল কিবলা থেকে ফিরিয়ে রাখা।

১৬ – হাতের বা মাথার ইশারায় সালামের জওয়াব দেয়া।

১৭ – হাই তোলা

১৮ – সামনে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পিছনের কাতারে দাঁড়ানো।

১৯ – বিনা প্রয়োজনে মিহ্‌রাবের ভিতরে ইমামের দাঁড়ানো।

২০ – বিনা প্রয়োজনে একহাত পরিমাণ উঁচু বা নীচু স্থানে ইমামের একা দাঁড়ানো।

২১ – ফরয নামাযে বিনা প্রয়োজনে দুই রাক'আতে একই সূরা পড়া, বা সবসময় নির্দিষ্ট কোন সূরা পড়া, বা তারতীবের খেলাফ সূরা পড়া, বা মাঝখানে ছোট সূরা বাদ দিয়ে দুই সূরা পড়া।

২২ – ক্বিরাআত শেষ না করেই রুকূতে যাওয়া এবং রুকূতে গিয়ে ক্বিরাআত শেষ করা।

২৩ – সামনে আগুন থাকা অবস্থায় নামায পড়া।

২৪ – বিনা ওযরে নাক বাদ দিয়ে শুধু কপাল দ্বারা সিজদা করা।

কয়েকটি মাসআলা

১ – কষ্টদায়ক কোন কারণে এক দু'বার শরীর চুলকানো মাকরূহ নয়।

২ – সিজদা করা সম্ভব না হলে সিজদার স্থান থেকে কংকর সরাবে। কিন্তু পূর্ণরূপে সিজদা করার জন্য একবারের বেশী সরাবে না।

৩ – নামাযে যাওয়ার পথে এবং নামাযের অপেক্ষায় থাকা অবস্থায়ও আঙ্গুল মটকানো এবং আঙ্গুল জড়ানো মাকরূহ।

৪ – মনের স্থিরতা নষ্ট হতে পারে অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ। (যেমন ইস্‌তিন্‌জার বেগ থাকা অবস্থায়, ক্ষুধা বা চাহিদার সময় খাবার উপস্থিত থাকা অবস্থায়।)

৫ – মোমবাতি বা কুপি সামনে রেখে নামায পড়া মাকরূহ নয়।

৬ – কোরআন সামনে থাকা অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ নয়।

৭ – ক্ষতির আশংকা থাকা অবস্থায় সাপ-বিচ্ছু মারা মাকরূহ নয়, (তবে আমলে কাছীর হলে নামায ভেঙ্গে যাবে, অবশ্য গোনাহ হবে না।)

৮ – রুকূতে, সিজদায় ও কিয়ামের অবস্থায় শরীরের সাথে চেপে থাকা কাপড় ঠিক করা মাকরূহ নয়।

প্রশ্নমালা

১ – নামাযের অবস্থায় দাড়িতে হাত দেয়া, জামার কলার ধরে টানা কোন্‌ ধরনের মাকরূহ, বলো।

২ – কী ধরনের কাপড়ে নামায পড়া মাকরূহ? এছাড়া অন্য কাপড় না পাওয়া গেলে তখন কী করবে?

৩ – যথানিয়মে যথাস্থানে হাত না রাখার বিষয়টি বিস্তারিত উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

৪ – নামাযের সময় চোখ বন্ধ রাখার প্রয়োজন বলতে কী বোঝো?

৫ – হাই তোলা মাকরূহ, কিন্তু হাই এসে গেলে কী করণীয়?

৬ – ইমামের কোথায় কী অবস্থায় দাঁড়ানো মাকরূহ এবং মাকরূহ নয়, বিস্তারিত বলো।

৭ – কামড় থেকে বাঁচার জন্য শরীরে বসা মশাকে মারা বা তাড়ানোর কী হুকুম ?

৮ – পিছনে জুতা বা সামান রেখে নামায পড়ার কী হুকুম এবং কেন?

৯ – নামাযের রোকন, ওয়াজিব ও সুন্নাত তরক করার কী হুকুম ?

নামায আদায়ের বিবরণ

তুমি যদি কোন নামায আদায় করতে চাও তাহলে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াও (দু'পায়ের গোড়া ও মাথা সমানভাবে কিবলামুখী থাকবে এবং মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক থাকবে।) এবং যে নামায আদায় করতে চাও সেই নামাযের নিয়ত করে দু'হাত দুই কানের লতি পর্যন্ত তোলো। (হাতের তালু ও আঙ্গুল কেবলামুখী থাকবে এবং আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা থাকবে, না বেশী লাগানো, না বেশী ছড়ানো)। তারপর الله أكبر বলো।

তাহরীমা বলার পর সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভীর নীচে রাখো। (ডান হাতের ছোট আঙ্গুল ও বুড়ো আঙ্গুল বাম হাতের কব্‌জিকে বেষ্টন করবে এবং বাকি তিন আঙ্গুল সোজা হয়ে থাকবে।)

তারপর নিঃশব্দে ثناء পড়ো। যথা–

سُبحانك اللهم و بِحَمدِك، و تَبارَكَ اسْمُك، و تَعالىٰ جَدُّك، و لا إله غيرُك

তারপর নিঃশব্দে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم এবং بسم الله الرحمن الرحيم বলো। তারপর سورة الفاتحة পড়ো, তারপর নিঃশব্দে آمين বলো। তারপর কোন সূরা বা কমপক্ষে ছোট ছোট তিনটি আয়াত বা বড় একটি আয়াত পড়ো।

তারপর الله أكبر বলে রুকূতে যাও। (পিঠ বিছানো থাকবে এবং মাথা ও নিতম্ব সমান থাকবে।) এবং আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক করে দু'হাতে দুই হাঁটু শক্ত করে ধরো। আর রুকূতে অন্তত তিনবার سبحان ربي العظيم বলো। তারপর سمع الله لمن حمده এবং ربنا و لك الحمد বলতে বলতে রুকু থেকে মাথা তোলো। (মুক্‌তাদী শুধু ربنا و لك الحمد বলবে।) এবং সোজা হয়ে দাঁড়াও।

তারপর তাকবীর বলা অবস্থায় সিজদায় রওয়ানা হও। এবং প্রথমে দুই হাঁটু, তারপর দুই হাত, তারপর দুই হাতের মাঝে কপাল ও নাক মাটিতে রাখো। (দুই বাহু মাটি থেকে এবং উদর ঊরুদ্বয় থেকে এবং দুই বাহু পার্শ্বদ্বয় থেকে দূরে থাকবে। তবে ভিড় থাকলে বাহু পার্শ্বের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে। হাত ও পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী থাকবে এবং হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিত থাকবে।) সিজদায় অন্তত তিনবার سبحان ربي الأعلي বলো।

তারপর তাকবীর বলা অবস্থায় মাথা তোলো এবং দুই সিজদার মাঝে ইতমিনানের সাথে তাশাহহুদের মত বসো এবং দু'হাত ঊরুদ্বয়ের উপর রাখো। বসা অবস্থায় মাগফিরাতের দু'আ করো। যেমন–

اللهم اغفِرْ لي و ارحَمْني و عافِني و اهدني و ارزُقْني

তারপর তাকবীর বলা অবস্থায় দ্বিতীয় সিজদায় যাও এবং অন্তত তিনবার سبحان ربي الأعلى বলো।

তারপর তাকবীর বলে সিজদা থেকে মাথা তোলো; তারপর দু'হাতে যমীনে ভর না দিয়ে এবং না বসে সোজা দাঁড়িয়ে যাও। এ পর্যন্ত একরাক'আত হলো।

(এবার দ্বিতীয় রাক'আত) প্রথম রাক'আতে যা যা করেছো দ্বিতীয় রাক'আতেও তা করো। তবে দু'হাত ওঠাবে না এবং ثناء ও تعوذ পড়বে না।

দ্বিতীয় রাক'আতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসো এবং আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করে ডান পা খাড়া রাখো। আর দু' হাত উরুদ্বয়ের উপর রাখো। (হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে ছড়ানো থাকবে এবং কিবলামুখী থাকবে।)

তারপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তাশাহহুদ পড়ো। যথা-

التَّحِيَّاتُ لله و الصلوات و الطيِّبات، السلام عليك أيها النبي و رَحمة الله و بَرَكاته، السلام علينا و عَلى عباد الله الصالحين، أشهَد أن لا إله إلا اللهُ و أشهد أن محمدًا عبدُه و رسولُه

আর لا إله বলার সময় বৃদ্ধা ও মধ্যমা দ্বারা বৃত্ত করে এবং শেষ দুই আঙ্গুল মুঠ করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা উপরের দিকে ইশারা করো এবং إلا الله বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল নামিয়ে ফেলো এবং সব আঙ্গুল সোজা করে রাখো। তোমার নামায দু'রাকাতী হলে তাশাহহুদের পর দুরূদে ইবরাহীমী পড়ো। যথা-

اللهم صَلِّ على مُحَمد و على آل محَمد كمَا صليتَ على إبراهيم وَ على آل إبراهيم، إنك حَميد مَجيد . اللهم بارِكْ على مُحَمد و على آل محمد كمَا باركتَ على إبراهيمَ و على آل إبراهيم، إنك حَميد مَجيد

তারপর নিজের জন্য الأدعية المأثورة থেকে কোন দু'আ করো। যেমন-

اللهم إني ظَلمتُ نفسي ظُلْماً كثيرا و إنَّه لا يغفِرُ الذنوبَ إلا أنت، فاغفِرْ لي

مغفرةً من عِندك، و ارحَمْني، إنك أنتَ الغفور الرحيم

তারপর السلام عليكم و رحمة الله বলে প্রথমে ডানে, পরে বামে সালাম ফেরাও। ডান দিকের সালামের সময় ডান দিকের মুছল্লীদের এবং নেককার জ্বিন এবং হিফাযতকারী ফিরেশতাদের নিয়ত করো। তদ্রূপ বাম দিকের সালামের সময় বাম দিকের মুছল্লীদের এবং নেককার জ্বিন এবং হিফাযতকারী ফিরেশতাদের নিয়ত করো। (আর মুক্‌তাদী হলে ইমামের দিকের সালামে ইমামের নিয়ত করো।)

আর তিনরাকাতী বা চাররাকাতী নামায হলে তাশাহহুদ পড়ে তাকবীর বলে তৃতীয় রাক'আতের জন্য সোজা দাঁড়িয়ে যাও। তৃতীয় রাক'আতে শুধু সূরাতুল ফাতিহা পড়ো। তারপর আগের নিয়মে রুকূ ও সিজদা করো। তিন রাকাতী নামায হলে শেষ বৈঠক শুরু করো। আর চাররাকাতী হলে তৃতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে তাকবীর বলে সোজা দাঁড়িয়ে যাও এবং শুধু সূরাতুল ফাতিহা পড়ে একই নিয়মে রুকূ-সিজদা করে শেষ বৈঠক শুরু করো।

প্রশ্নমালা

১ – সিজদা পর্যন্ত (সিজদাসহ) নামায আদায়ের বিবরণ দাও।

২ – দ্বিতীয় রাক'আত শেষে করণীয় কী, বলো।

৩ – শেষ বৈঠকের বিবরণ দাও।

৪ – যোহরের চার রাক'আত পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করে দেখাও।

৫ – ছেলেদের ও মেয়েদের বসার ছূরত বলো এবং দেখাও।

জামা'আতের বিবরণ

যদি শরীয়তসম্মত কোন ওযর না থাকে তাহলে প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন পুরুষের জন্য জামা'আতের সঙ্গে নামায পড়া ওয়াজিব। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন জামা'আতের পাবন্দী করেছেন। তদ্রূপ ছাহাবা কেরামের যামানা থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত উম্মত জামা'আতের পাবন্দী করে এসেছে। ছাহাবা কেরামের যুগে জামা'আতের

এত গুরুত্ব ছিলো যে, মাযূর ও প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া কেউ জামা'আত তরক করতেন না। জামা'আত তরকে অভ্যস্ত ব্যক্তি ফাসিক এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১]

হাদীছ শরীফে জামা'আতের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন –

صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ و عشرين دَرَجَةً (رواه مسلم)

"জামা'আতের নামায একা নামাযের চেয়ে সাতাশ গুণ উত্তম।"

জুমু'আ ছাড়া যে কোন নামাযে ইমাম ও একজন মুক্‌তাদী দ্বারা জামা'আত হয়ে যায়। জুমু'আর জামা'আতের জন্য ইমাম ছাড়া তিনজন পুরুষ আবশ্যক।

যে কোন নামায জামা'আত ছাড়াও আদায় হয়ে যায়, তবে জুমু'আ ও দুই ঈদের জন্য জামা'আত শর্ত। জামা'আত ছাড়া জুমু'আ ও ঈদের নামায ছহী নয়।

স্ত্রীলোক, বালক, অসুস্থমস্তিষ্ক, গোলাম ও ওযরগ্রস্ত ব্যক্তির উপর জামা'আত ওয়াজিব নয়। তবে তারা জামা'আতে নামায পড়লে ছাওয়াবের অধিকারী হবে। অবশ্য স্ত্রীলোকদের ঘরে নামায পড়াই উত্তম।

জামা'আত ওয়াজিব না হওয়ার ওযর

০ প্রচণ্ড বৃষ্টি বা ঠাণ্ডা বা অন্ধকার হলে, পথে ভীষণ কাদা হলে, রাতে প্রচণ্ড ঝড় হলে, হেঁটে মসজিদে যেতে না পারার মত অসুস্থ বা বৃদ্ধ হলে এবং অন্ধের সাহায্যকারী না থাকলে জামা'আতে যাওয়া ওয়াজিব নয়।

০ কেউ যদি এমন রোগীর সেবায় ব্যস্ত থাকে যে, তার অনুপস্থিতিতে রোগীর ক্ষতি বা কষ্ট হবে, তার উপরও জামা'আত ওয়াজিব নয়।

০ সফরে কাফেলার যাত্রার সময় হয়ে গেলে, গাড়ী ও জাহাজ ছেড়ে দেয়ার সময় হয়ে গেলে এবং সামান হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে

---

১. وَ الجماعَةُ سنّة مُؤَكَّدَةٌ شَبِيهَةٌ بِالوَاجِبِ، و تَنعَقِدُ الجمَاعَةُ في الصَّلَوات كُلِّها بِواحِدٍ مَعَ الإمامِ، إلاَّ الجُمُعَةَ، و تَنعَقِدُ الجماعَة في الجُمُعَةِ بثلاثَةِ رجالٍ سِوَى الإمامِ

জামা'আতে শরীক হওয়া ওয়াজিব নয়।

০ ইস্‌তিন্‌জার হাজত হলে, ক্ষুধার সময় খাবার উপস্থিত হলে এবং খাওয়ার চাহিদা থাকলে জামা'আতে শরীক হওয়া ওয়াজিব নয়।

কয়েকটি মাসআলা

১ – তুমি যদি ওযরের কারণে জামা'আতে যেতে না পারো, অথচ তোমার জামা'আতে শরীক হওয়ার পূর্ণ নিয়ত ছিলো তাহলে ইনশাআল্লাহ তুমি জামা'আতের ছাওয়াব ও ফযীলত লাভ করবে।

২ – সালামের কিছু পূর্বে আখেরী বৈঠকে ইমামের সঙ্গে শরীক হতে পারলেও জামা'আতের ফযীলত হাছিল হবে।

৩ – ইমামকে নামাযের যে অংশেই পাওয়া যাক, দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীর বলে সেখানেই ইমামের সঙ্গে শরীক হওয়া কর্তব্য। তবে ইমামকে অন্তত রুকূতে না পেলে ঐ রাক'আতটি পাওয়া গেছে, বলা যাবে না।

৪ – যে মসজিদে নির্ধারিত ইমাম ও মুআযযিন রয়েছে এবং আযান ইকামতসহ জামা'আত হয়ে গেছে সেখানে দ্বিতীয় জামা'আত করা মাকরূহ। তবে দ্বিতীয় জামা'আতের ইমাম স্থান পরিবর্তন করে দাঁড়ালে মাকরূহ হবে না।

৫ – মুক্‌তাদী যদি শুধু একজন পুরুষ বা বুঝের বালক হয় তাহলে মুক্‌তাদী ইমামের ডানে দাঁড়াবে এবং গোড়ালি পরিমাণ পিছিয়ে দাঁড়াবে। দু'জন হলে ইমাম সামনে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে এক বা একাধিক স্ত্রীলোক হলে ইমাম অবশ্যই সামনে দাঁড়াবে।

৬ – স্ত্রীলোকদের একা জামা'আত করা মাকরূহ। তবু যদি তারা একা জামা'আত করে তবে ইমাম ছাহেবা সামনে না দাঁড়িয়ে কাতারের মাঝে সামান্য এগিয়ে দাঁড়াবে।

৭– নারী, পুরুষ ও অবুঝ বালক একত্র হলে প্রথম কাতারে পুরুষেরা, দ্বিতীয় কাতারে বালকেরা এবং তৃতীয় কাতারে নারীরা দাঁড়াবে।

৮ – যদি একটি মাত্র বালক থাকে তাহলে সে পুরুষদের কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে। পরে কয়েকজন বালক এসে গেলে তারা পুরুষদের পিছনেই দাঁড়াবে। তাদের দ্বারা পুরুষদের কাতার পূর্ণ করা যাবে না।

৯ – কেউ যদি বিলম্বে এসে দেখে যে, ইমাম রুকুতে আছে, আর কাতারে জায়গা আছে তাহলে রাক'আত ধরার জন্য তাড়াহুড়া করে পিছনে দাঁড়াবে না, বরং রাক'আত ছুটে গেলেও ধীরে সুস্থে কাতারের খালি জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে।

প্রশ্নমালা

১ – জামা'আতের ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীছ বলো।

২ – কোন্ কোন্ নামায জামা'আত ছাড়া আদায় করা যায় না।

৩ – জামা'আত ছহী হওয়ার সর্বনিম্ন সংখ্যা কত।

৪ – ইমাম ছাড়া একজন পুরুষ, একজন বুঝের বালক এবং একজন স্ত্রীলোক রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইমাম জুমু'আ পড়বেন, না যোহ্‌র পড়বেন? কারণসহ বলো।

৫ – জামা'আতে হাজির না হওয়ার ওযরগুলো বলো।

৬ – জামা'আতে শরীক হলে দোকানের বড় খরিদ্দার ছুটে যাবে এবং আর্থিক ক্ষতি হবে, এখন কী করণীয়?

৭ – একই মসজিদে দ্বিতীয় জামা'আত করার কী হুকুম?

৮ – ইমাম ও মুক্‌তাদীর দাঁড়ানোর নিয়ম বলো।

৯ – মুক্‌তাদীদের কাতারের তরতীব বলো।

ইমামতের আহকাম ও মাসায়েল

নামাযের জাম'আতে ইমাম হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব। সুতরাং ইমামের কর্তব্য হলো নিজের দায়িত্বের প্রতি সচেতন ও যত্নবান হওয়া, আর মুক্‌তাদীর কর্তব্য হলো ইমামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং ইমামের সাধারণ ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা না করা।

ইমাম হওয়ার জন্য শর্ত হলো–

১. পুরুষ হওয়া ২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ৩. সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া ৪. ফরয পরিমাণ ক্বিরাআত পাঠে সক্ষম হওয়া ৫. উচ্চারণে لثغة এর দোষ থেকে মুক্ত হওয়া ৬. ওযর থেকে মুক্ত হওয়া ৭. নামাযের আরকান ও শর্তের ক্ষেত্রে ইমামের অবস্থা মুক্‌তাদী থেকে উত্তম বা সমান হওয়া।

সুতরাং 'প্রায়প্রাপ্তবয়স্ক' এবং নামাযের বুঝ-সমঝের অধিকারী বালক ফরয নামাযে প্রাপ্তবয়স্কদের ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়।

তদ্রূপ স্ত্রীলোকের পিছনে পুরুষের ইকতিদা ছহী নয়, তবে স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকদের ইমাম হতে পারে, যদিও স্ত্রীলোকদের একক জামা'আত মাকরূহ।

তদ্রূপ এক ওযরওয়ালা অন্য ওযরওয়ালার ইমাম হতে পারে না, তবে একই ওযরওয়ালারা একে অন্যের ইমাম হতে পারে।

তদ্রূপ ক্বিরাআত পাঠে সক্ষম ব্যক্তি কোন উম্মী বা বোবার পিছনে এবং সতরওয়ালা ব্যক্তি বে-সতর ব্যক্তির পিছনে এবং সুস্থ ব্যক্তি ইশারায় নামায আদায়কারীর পিছনে ইক্‌তিদা করতে পারে না।

যার উচ্চারণে لُثْغَة এর দোষ আছে সে শুদ্ধ উচ্চারণকারীর ইমাম হতে পারে না।

لثغة মানে উচ্চারণে হরফ পরিবর্তন হয়ে যাওয়া। যেমন س কে ث এবং ط কে ت উচ্চারণ করা।

০ ফাসিক-ফাজির ও বিদ'আতীকে এবং আলিমের উপস্থিতিতে জাহিলকে ইমাম বানানো মাকরূহ, তবে তাদের পিছনেও নামায ছহী হবে।

০ সত্যিকার কোন ত্রুটির কারণে মানুষ যাকে অপছন্দ করে তার ইমাম হওয়া মাকরূহ।

০ যদি অধিকতর উপযুক্ত কাউকে না পাওয়া যায় তবে অন্ধকে ইমাম বানানো মাকরূহ নয়

ইমামতের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার

শাসক এবং তার প্রতিনিধি ইমামতের বেশী হকদার।

কোন মসজিদের নির্ধারিত ইমাম সেই মসজিদে অন্যের চেয়ে ইমামতের বেশী হকদার।

কারো বাড়ীতে জামা'আত হলে এবং বাড়ীর মালিক ইমামতের উপযুক্ত হলে তিনিই ইমামতের বেশী হকদার।

জামা'আতে যদি শাসক বা তার প্রতিনিধি না থাকে, তদ্রূপ মসজিদের নির্ধারিত ইমাম বা বাড়ীর মালিক যদি না থাকে তখন উপস্থিত লোকদের মাঝে ইমামতের বেশী হকদার হবে–

যে নামাযের মাসায়েলের জ্ঞানে বড়। এ ক্ষেত্রে সমান হলে, যে ক্বিরাআতের মানে ও পরিমাণে বড়। এক্ষেত্রে সমান হলে, যে পরহেযগারিতে বড়। এ ক্ষেত্রে সমান হলে, যে বয়সে বড়।

এসব ক্ষেত্রে সমান হলে মানুষ যাকে নির্বাচন করবে সে-ই ইমাম হবে। যদি মতপার্থক্য দেখা দেয় তবে অধিকাংশ মানুষ যাকে পছন্দ করবে সবাই তার পিছনে নামায পড়ে নেবে।

কয়েকটি মাসআলা

১ – যাদেরকে ইমাম বানানো মাকরূহ তারা নিজেরা আগে বেড়ে ইমাম হয়ে গেলে সে কারণে জামা'আত তরক করা যাবে না এবং মুসলমানদের মাঝে বিরোধ ও ফিতনা সৃষ্টি করা যাবে না।

২ – কোন কোন আলিমের মতে নামাযের বুঝ ও সমঝওয়ালা বালক নফল ও তারাবীর ইমাম হতে পারবে।

৩ – একজন নামাযের মাসায়েলের জ্ঞানে বড়, আরেকজন ক্বিরাআতে বড়, তাহলে মাসায়েলের জ্ঞানে যে বড় সে-ই ইমামতের বেশী হকদার। তদ্রূপ একজন বয়সে বড়, আরেকজন পরহেযগারিতে বড়, তাহলে যে বয়সে বড় সে-ই বেশী হকদার।

৪ – ইমামের জন্য ক্বিরাআত ও রুকূ-সিজদা এত লম্বা করা মাকরূহ

যাতে মানুষ জামা'আতে আসা ছেড়ে দেয়। তবে মুছুল্লীদের কারণে নামাযের সুন্নাত-মুস্তাহাব তরক করা যাবে না।

প্রশ্নমালা

১ – ইমামতের শর্তগুলো বলো।

২ – উচ্চারণের لثغة মানে কী?

৩ – বালকের ইমাম হওয়ার মাসআলা কী?

৪ – তিনজনের নাক থেকে রক্ত ঝরছে, তিনজনের পেশাব ঝরছে, তিনজনের বায়ু বের হচ্ছে; এরা কীভাবে জামাত করবে ?

৫ – ওযরওয়ালা ব্যক্তির ইমামত ছহী হওয়া না হওয়ার ছুরতগুলো উদাহরণসহ উল্লেখ করো।

৬ – কাদেরকে ইমাম বানানো মাকরূহ এবং তারা ইমাম হয়ে গেলে কী করণীয়?

৭ – ইমামতের অগ্রাধিকারের মাসআলাটি বর্ণনা করো।

৮ – মেজবান সাধারণ মানুষ, আর মেহমানদের একজন হলেন উপস্থিত সকলের মাঝে সবচেয়ে বড় আলিম,ক্বারী, পরহেযগার ও বয়স্ক, অথচ মেযবান ইমাম হতে চাচ্ছেন, আর সবাই ঐ মেহমানকে ইমাম বানাতে চায়। মীমাংসার জন্য বিষয়টি তোমার কাছে পেশ করা হলে তুমি কী সমাধান দেবে?

ইক্‌তিদার মাসায়েল

ইক্‌তিদা ছহী হওয়ার জন্য শর্ত হলো–

১. মুক্‌তাদী তাহরীমার সময় ইমামের ইক্‌তিদার নিয়ত করা। (অর্থাৎ মনে মনে বলবে যে, আমি এই ইমামের পিছনে ইক্‌তিদা করছি।)

২. ইমাম থেকে অন্তত এক গোড়ালি পরিমাণ পিছনে দাঁড়ানো। সুতরাং ইমামের সমানে বা সামনে দাঁড়ালে ইক্‌তিদা ছহী হবে না।

৩. ইমাম ও মুক্‌তাদীর মাঝে বেশী দূরত্ব না থকা। সুতরাং খোলা ময়দানে বা বড় হলঘরে ইমাম ও মুক্‌তাদীর মাঝে দুই বা দুইয়ের বেশী কাতারের জায়গা খালি থাকলে ইক্‌তিদা ছহী হবে না।

তদ্রূপ ইমাম ও মুক্‌তাদীর মাঝে যদি গাড়ীর চলাচলের মত রাস্তা বা নৌকা চলাচলের মত খাল থাকে এবং কাতার সংযুক্ত না থাকে তাহলে ইক্‌তিদা ছহী হবে না।

০ মসজিদকে একই স্থান বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং ইমাম যদি মসজিদের ভিতরে আর মুক্‌তাদী বারান্দায় দাঁড়ায় তাহলে মাঝখানের দূরত্বের কারণে ইক্‌তিদা নষ্ট হবে না।

০ যদি মসজিদের বাইরে কোন দোকানে বা বাড়ীতে দাঁড়িয়ে ইক্‌তিদা করে, আর কাতার সংযুক্ত থাকে তাহলে ইক্‌তিদা ছহী হবে।

৪. ইমাম ও মুক্‌তাদীর ফরয নামায অভিন্ন হওয়া। সুতরাং ইমাম যদি আছরের নামায পড়ে, আর মুক্‌তাদী যোহরের নিয়ত করে তাহলে ইক্‌তিদা ছহী হবে না।

৫. ইমামের নামায মুক্‌তাদীর চেয়ে কম দরজার না হওয়া। সুতরাং নফলীর পিছনে ফরযীর ইক্‌তিদা ছহী হবে না, কিন্তু ফরযীর পিছনে নফলীর ইক্‌তিদা ছহী হবে।

০ কোন আড়ালের কারণে মুক্‌তাদী যদি ইমামের ওঠা-বসা দেখতে না পায়, কিংবা তাকবীরের আওয়ায শুনতে না পায় তাহলে ইক্‌তিদা ছহী হবে না।

০ তায়াম্মুমওয়ালা ইমামের পিছনে অযুওয়ালা মুক্‌তাদীর ইক্‌তিদা ছহী হবে। মোযার উপর মাসাহকারী ইমামের পিছনে অন্যদের ইক্‌তিদা ছহী হবে। বসে নামায আদায়কারীর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর ইক্‌তিদা ছহী হবে। ইশারায় নামায আদায়কারীর পিছনে একই রকম ইশারায় নামায আদায়কারীর ইক্‌তিদা ছহী হবে।

০ ইমামের নামায ফাসিদ হলে মুক্‌তাদীর নামাযও ফাসিদ হয়ে যায়। সুতরাং ইমাম যদি জানতে পারেন যে, কোন কারণে তার নামায ফাসিদ হয়ে গেছে তাহলে তার অবশ্যকর্তব্য হবে মুক্‌তাদীদেরকে তা জানিয়ে দেয়া, যেন তারা তাদের নামায দোহরাতে পারে।

০ মুক্‌তাদীর কর্তব্য হলো ফরয-ওয়াজিব সর্ববিষয়ে ইমামের অনুগমন করা। তবে ইমাম যদি মুক্‌তাদীর তাশাহহুদ শেষ হওয়ার আগে তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে যান বা সালাম করে ফেলেন তাহলে মুক্‌তাদী

ইমামের অনুগমন না করে আগে তাশাহহুদ শেষ করবে, তারপর দাঁড়াবে বা সালাম করবে। তবে তাশাহহুদ শেষ না করে ইমামের অনুগমন করলেও নামায হয়ে যাবে।

ইমাম যদি মুক্‌তাদীর দুরূদ শেষ হওয়ার আগে সালাম করে ফেলে তাহলে মুক্‌তাদী ইমামের অনুগমনে সালাম করে ফেলবে।

ইমাম তাশাহহুদ থেকে ফারেগ হওয়ার আগে মুক্‌তাদী যদি নিজে নিজে সালাম ফিরিয়ে ফেলে তাহলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। তাশাহহুদের পরে হলে নামায হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ হবে।

০ ইমাম অতিরিক্ত সিজদা দিলে মুক্‌তাদী ইমামের অনুগমন করবে না।

০ ইমাম যদি শেষ বৈঠকের পর ভুলে দাঁড়িয়ে যান তাহলে মুক্‌তাদী ইমামের অনুগমন না করে (তাসবীহ বলে তাকে সতর্ক করবে এবং) তার বৈঠকে ফিরে আসার অপেক্ষা করবে। ইমাম যদি ফিরে না এসে ঐ রাক'আতের সিজদাও করে ফেলেন তাহলে মুক্‌তাদী একা সালাম ফেরাবে।

ইমাম যদি শেষ বৈঠকের আগে ভুলে অতিরিক্ত রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যান তাহলে মুক্‌তাদী ইমামের অনুগমন না করে, তাসবীহ বলে ইমামকে সতর্ক করবে এবং তার ফিরে আসার অপেক্ষা করবে।

ইমাম যদি ফিরে না এসে অতিরিক্ত রাক'আতের সিজদাও করে ফেলেন তাহলে মুক্‌তাদী একা সালাম ফিরিয়ে ফেলবে। কিন্তু মুক্‌তাদী যদি ইমামের সিজদার আগেই সালাম ফিরিয়ে ফেলে তাহলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।

কয়েকটি মাসআলা

১ – মুক্‌তাদী ইমামের আগে বা পিছনে হওয়ার বিষয়টি বিচার করা হবে মুক্‌তাদীর গোড়ালি দিয়ে। সুতরাং মুক্‌তাদীর গোড়ালি যদি ইমামের গোড়ালির পিছনে হয়, কিন্তু লম্বা হওয়ার কারণে তার সিজদার জায়গা ইমামের সিজদার চেয়ে সামনে হয়, কিংবা তার পায়ের আঙ্গুল ইমামের আঙ্গুলের চেয়ে সামনে হয় তাহলে ইক্‌তিদা বাতিল হবে না।

২ – ইমাম ও মুক্‌তাদী যদি দুই জাহাজে হয় এবং জাহাজ দু'টি পরস্পর যুক্ত হয় তাহলে দুই জাহাজকে এক স্থান ধরা হবে এবং ইক্‌তিদা ছহী হবে।

৩ – জাহ্‌রী ও সাররী কোন নামাযেই মুক্‌তাদী ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে ইমামের অনুগমন করবে না, বরং ইমামের ক্বিরাআত শোনবে বা নীরব থাকবে। মুক্‌তাদীর ক্বিরাআত পড়া মাকরূহে তাহ্‌রীমী।

প্রশ্নমালা

১ – ইক্‌তিদা ছহী হওয়ার শর্তগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

২ – ইমামের ওঠা-বসা দেখা যাচ্ছে না, তার আওয়াযও শোনা যাচ্ছে না, তবে মুকাব্বিরের ব্যবস্থা রয়েছে, এ অবস্থার কী হুকুম?

৩ – চলন্ত দুই নৌকায় ইমাম ও মুক্‌তাদী নামায আদায় করলে দ্বিতীয় নৌকার মুক্‌তাদীদের ইক্‌তিদা ছহী হবে কিনা এবং কেন?

৪ – একই জাহাযের দুই কাতারের মাঝে কয়েক কাতার পরিমাণ ফাঁক আছে, এ অবস্থার কী হুকুম?

৫ – মুক্‌তাদীর তিন তাসবীহ্ শেষ হওয়ার আগে ইমাম রুকূ বা সিজদা থেকে মাথা তুলে ফেললে মুক্‌তাদীর করণীয় কী? এবং তা পিছনের কোন্ মাসআলা থেকে বোঝা যায়?

৬ – ইমাম আজকের যোহর পড়ছেন, আর মুক্‌তাদী কালকের যোহর পড়ছে, এ অবস্থার হুকুম কী ও কেন?

৭ – ইমাম জাহাযে, আর মুক্‌তাদীরা নদীর তীরে, এ অবস্থার হুকুম কী ও কেন?

যানবাহনের নামায

০ পশু-সওয়ারির উপর ফরয ও ওয়াজিব নামায দু'টি শর্তে ছহী হবে। প্রথমত শহর ও জনপদের বাইরে হওয়া। (মুসাফির হোক বা না হোক) দ্বিতীয়ত বাহন থেকে নামতে না পারার মত গ্রহণযোগ্য ওযর থাকা। যেমন, শত্রুর বা হিংস্র প্রাণীর ভয়, কাদার আধিক্য ইত্যাদি।

যদি সওয়ারি থেকে নামার পর নিজে নিজে ওঠা সম্ভব না হয়, আর সাহায্যকারী না থাকে তাহলে সওয়ারিতেই ফরয ও ওয়াজিব নামায পড়তে পারে।

০ শহর ও জনপদের বাইরে বিনা ওযরে পশু-সওয়ারির উপর সুন্নাতে মুআক্কাদা ও নফল পড়া যায়, তবে ফজরের সুন্নাতের জন্য নামতে হবে, কেননা ফজরের সুন্নাতের গুরুত্ব বেশী।

শহর ও জনপদে পশু-সওয়ারির উপর নফল পড়া জায়েয নয়।

০ শহর ও জনপদের বাইরে পশু-সওয়ারির উপর ইশারার মাধ্যমে রুকূ-সিজদা আদায় করবে, তবে সিজদার ইশারা রুকূর ইশারার চেয়ে নীচু হবে। সওয়ারি যদি কিবলা থেকে ঘুরে যায় তাহলেও অসুবিধা নেই।

জলযানের নামায

০ জলযান থেকে নামা সম্ভব হলে নেমে নামায পড়াই মুস্তাহাব। কোন কারণে নামা সম্ভব না হলে জলযানে নামায পড়ায় কোন বাধা নেই।

০ জলযান যদি তীরে বাঁধা থাকে বা মাঝ নদীতে স্থির থাকে তাহলে দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে রুকূ-সিজদাসহ নামায আদায় করতে হবে। বসে নামায পড়া ছহী হবে না। কেননা সে কিয়ামে সক্ষম।

আবু হানীফা (রহ) এর মতে চলন্ত জলযানে বিনা ওযরে বসে নামায পড়া জায়েয, ছাহেবায়নের মতে জায়েয নয়।

০ জলযানে বসে রুকূ-সিজদা করতে সক্ষম হলে ইশারায় রুকূ-সিজদা করা জায়েয নয়।

০ নামাযের অবস্থায় জলযান কিবলা থেকে ঘুরে গেলে মুছল্লীকেও কিবলার দিকে ঘুরে যেতে হবে; নচেৎ নামায হবে না। যদি জলযানের ঘুরে যাওয়ার বিষয়টি জানতে না পারে তাহলে অসুবিধা নেই।

ট্রেনে ও বিমানে নামায

০ আবু হানীফা (রহ) এর মতে চলন্ত ট্রেনে ও উড়ন্ত বিমানে বিনা ওযরে বসে নামায পড়া জায়েয। অধিকাংশ ইমামের মতে ওযর ছাড়া তা জায়েয নয়।

ট্রেন বা বিমান যদি এত বেশী নড়ে যে, দাঁড়িয়ে থাকা দুষ্কর তাহলে সবার মতেই বসে নামায পড়া জায়েয।

স্থির ট্রেনে ও বিমানে কারো মতেই বিনা ওযরে বসে নামায পড়া জায়েয নয়।

০ যদি দুই আসনের মাঝে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, আর মেঝেতে সিজদা করা সম্ভব না হয় তাহলে আসনের উপর সিজদা করতে পারে।

০ কিবলামুখী হয়ে নামায শুরু করার পর ট্রেন বা বিমান যদি কিবলা থেকে সরে যায়, তাহলে তাকেও কিবলার দিকে ঘুরে যেতে হবে। যদি ঘোরা সম্ভব না হয়, কিংবা ট্রেন ও বিমানের ঘুরে যাওয়া কথা জানতে না পারে তবে তার নামায হয়ে যাবে।

কয়েকটি মাসআলা

১ – পশু-সওয়ারিতে ওঠার পর আগের তিলাওয়াতি সিজদা আদায় করা ছহী হবে না।

সওয়ারিতে ওঠার পর তিলাওয়াতি সিজদা ওয়াজিব হলে সওয়ারিতেই ইশারার মাধ্যমে সিজদা আদায় করা জায়েয হবে, কেননা যে অবস্থায় ওয়াজিব হয়েছে সে অবস্থায়ই সে তা আদায় করেছে।

২ – শত্রুর বা হিংস্র প্রাণীর ভয় হলে পশুর চলা অবস্থায়ও তার পিঠে নামায পড়তে পারে। কিন্তু কাদার ওযর বা নামার পর উঠতে না পারার ওযর হলে চলা অবস্থায় নামায পড়া যাবে না।

৩ – বিমানে যদি নিরাপত্তার কারণে অযু করতে নিষেধ করা হয় তাহলে অযু করা উচিত নয়, বরং তায়াম্মুম করে নামায পড়বে।

প্রশ্নমালা

১ – পশু-বাহনে নফল নামায ছহী হওয়ার কী শর্ত?

২ – পশু-বাহনে ফরয ও ওয়াজিব নামায ছহী হওয়ার কী শর্ত?

৩ – নফল নামায শুরু করার পর ভেঙ্গে ফেললো, তারপর সওয়ারিতে উঠে তা আদায় করলো, এই নামাযের হুকুম বলো।

৪ – সওয়ারিতে বিতির নামায আদায় করার হুকুম বলো।

৫ – কী কী ওযরে সওয়ারিতে ফরয বা ওয়াজিব নামায আদায় করা যায়?

৬ – পশু-সওয়ারিতে ফরয-ওয়াজিব ও নফল নামাযে ভিন্নতা কী এবং অভিন্নতা কী?

৭ – সওয়ারি থেকে নামার পর ওঠা সম্ভব নয়, এ অবস্থায় চলন্ত সওয়ারির উপর নামায পড়ার কী হুকুম?

৮ – চলন্ত ও স্থির ট্রেনে বা বিমানে বিনা ওযরে বসে ফরয নামায পড়ার হুকুম বলো।

৯ – ট্রেনে, বিমানে ও জলযানে কিবলার কী হুকুম বলো।

বিতিরের নামায

বিতির হলো ওয়াজিব নামায। শারীআতে বিতিরের বহু গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لم يُوْتِرْ فليسَ مِنَّا (رواه أبو داؤد)

বিতির যেহেতু ওয়াজিব সেহেতু কেউ যদি ভুলে গিয়ে বা ইচ্ছাকৃত-ভাবে বিতির তরক করে তাহলে তা কাযা করা ওয়াজিব হবে।

০ বিতির এক সালামে তিন রাক'আত পড়তে হবে। এশা ও বিতিরের সময় অভিন্ন, তবে তা আদায় করতে হবে এশার পরে। এশা আদায়ের আগে বিতির আদায় করা ছহী নয়।

০ কিয়ামে সক্ষম অবস্থায় বসে বিতির পড়া ছহী নয় এবং ওযর ছাড়া পশু-বাহনের উপর বিতির আদায় করা ছহী নয়।

০ বিতিরের তিন রাক'আতেই ক্বিরাআত ফরয এবং ফাতিহা ও সূরা ওয়াজিব।

০ বিতিরের প্রথম দু'রাক'আতের পর তাশাহহুদের জন্য বসা ওয়াজিব।

তাশাহহুদের পর দাঁড়িয়ে ثناء ও تعوذ পড়বে না, বরং বিসমিল্লাহ পড়ে

ফাতিহা শুরু করবে। তারপর সূরা যোগ করবে। তারপর তাহরীমার মত দু'হাত কানের লতি পর্যন্ত তুলে তাকবীর বলবে। তারপর দাঁড়ানো অবস্থায় قنوت পড়বে। তারপর রুকূতে যাবে। সারা বছর বিতিরে কুনূত পড়া ওয়াজিব।

ইমাম, মুক্‌তাদী ও মনুফারিদ কুনূত নিঃশব্দে পড়বে। কুনূত এই–

اللّٰهم إِنَّا نستَعِينُك، و نستَغْفِرك، و نُؤمن بك، و نَتَوكَّل عليك، و نُثنِي عليك الخيرَ، و نَشكرك، و لا نكفُرك، و نَخْلَع، و نترك من يَفْجُرك، اللّٰهم إِيَّاك نعبُد، و لك نُصَلي، و نسجُد، و إليك نَسْعٰى، و نَحْفِد، و نرجو رحمتَك، و نخشٰى عَذابَك، إن عَذابك بِالكُفَّار مُلْحِقٌ.

o তুমি যদি কুনূত পড়া ভুলে যাও, আর রুকূতে গিয়ে, কিংবা রুকূ থেকে ওঠার পর মনে পড়ে তাহলে আর কুনূত পড়বে না, বরং সালামের পর সাহূ সিজদা দেবে। কেননা তুমি ভুলে একটি ওয়াজিব তরক করেছো।

যদি রুকূ থেকে উঠে কুনূত পড়ো তাহলে দ্বিতীয়বার রুকূ করবে না, তবে একটি ওয়াজিব বিলম্বিত হওয়ার কারণে সাহূ সিজদা দেবে।

o ইমাম যদি তোমার কুনূত শেষ হওয়ার আগে রুকূতে চলে যান তাহলে তুমি কুনূত শেষ করে রুকূতে গিয়ে ইমামের সঙ্গে শরীক হবে। তবে রুকূ ফাওত হওয়ার আশংকা হলে কুনূত ছেড়ে ইমামের সঙ্গে রুকূতে চলে যাবে।

ইমাম কুনূত ছেড়ে দিলে তুমি কুনূত পড়ে ইমামের সঙ্গে রুকূতে শরীক হবে। তবে রুকূ ফাওত হওয়ার আশংকা হলে কুনূত ছেড়ে ইমামের সঙ্গে রুকূতে চলে যাবে।

রামাযানে বিতিরের নামায জামা'আতের সাথে পড়াই উত্তম। অন্য সময় বিতিরের জামা'আত মাকরূহ।

o তুমি যদি মাসবূক হও এবং বিতিরের তৃতীয় রাক'আতের রুকূতে ইমামের সঙ্গে শরীক হও তাহলে তুমি পরোক্ষভাবে কুনূত পেয়েছো বলে ধরা হবে। সুতরাং অবশিষ্ট বিতির পড়ার জন্য যখন দাঁড়াবে তখন তুমি আর কুনূত পড়বে না।

কয়েকটি মাসআলা

১ – রাত্রে বিতির পড়া না হলে পরে তা কাযা করতে হবে।[1]

২ – শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পর বিতির পড়া উত্তম, তবে জাগ্রত হওয়ার বিষয়ে নিজের উপর আস্থা না থাকলে এশার পরই পড়ে নেবে।[2]

৩ – আমাদের মাযহাবে বিতির ছাড়া অন্য কোন নামাযে কুনূত নেই। তবে বড় বড় জাতীয় দুর্যোগের সময় ইমাম ফজরের দ্বিতীয় রাক'আতে রুকূ থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় কুনূত পড়বেন। এটাকে قنوت النازلة বলে। এবং তা এই –

اللهُمَّ اهدِنا بِفَضْلِك فِيْمَن هَديتَ، و عافِنا فيمَنْ عافَيْتَ، و تَوَلَّنا فِيمن تَوَلَّيْتَ، و بارِك لنا فِيما أعطَيْتَ، و قِنَا شَرَّ ما قَضَيْتَ، فَإِنَّك تقضِي و لا يُقْضٰى عليك، إنه لا يَذِلُّ من وَالَيْتَ، و لا يَعِزُّ من عادَيْتَ، تبارَكْتَ ربَّنا و تعالَيْتَ، و صلى الله على سَيِّدِنا محمد و آله و صَحْبِه و سلم

প্রশ্নমালা

১ – বিতির ওয়াজিব হওয়ার ফলাফল কী?

২ – বিতির তরক হলে কাযা করতে হয় কেন এবং বিনা ওযরে বিতির বসে পড়া ছহী নয় কেন?

৩ – নফলের সঙ্গে বিতিরের মিল কোথায়?

৪ – কুনূত পড়ার বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৫ – কুনূত পড়া ভুলে গেলে কী করণীয় বলো।

---

১. الوِتْرُ ثلاثُ رَكَعاتٍ بِتَسليمَةٍ واحدَةٍ، و هو واجب، فَلَوْ تَرَكَ الوِتْرَ ناسِيًا أو عامِدًا وجَبَ عليه قَضاؤُه ·

২. و يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَألَفُ صلاةَ اللَّيْلِ أن يُؤَخِّر الوترَ إلى آخر الليلِ، و إنْ خافَ أن لا يقومَ آخِرَ الليلِ أَوْتَرَ أولَ الليلِ ·

৬ – ইমাম কুনূত পড়া ভুলে রুকূতে চলে গেলে তোমার কী করণীয়?

৭ – বিতির পড়ার সময় সম্পর্কে আলোচনা করো।

৮ – কুনূতে নাযেলাহ্‌ কী ও কেন?

সুন্নাত নামায

০ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত যে সকল নামায পড়তেন সেগুলোকে النوافل বা الصلوات المسنونة বলে।

০ ফরযের আগে বা পরে যে সকল সুন্নাত নামায নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত পড়তেন, কখনো বাদ দিতেন না, সেগুলোকে বলে السنن المؤكَّدة – এগুলোর গুরুত্ব ওয়াজিবের কাছাকাছি। সুতরাং বিনা ওযরে এগুলো বাদ দেয়ার অভ্যাস হয়ে গেলে গোনাহ্‌ হবে।

সুন্নতে মুআক্কাদাহ্‌ নামাযগুলো এই –

১. ফজরের আগে দুই রাক'আত ২. যোহরের আগে এক সালামে চার রাক'আত ৩. যোহরের পরে দুই রাক'আত ৪. মাগরিবের পর দুই রাক'আত ৫. এশার পর দুই রাক'আত ৬. জুমু'আর ফরযের আগে এক সালামে চার রাক'আত ৭. জুমু'আর ফরযের পরে এক সালামে চার রাক'আত।

০ যে সকল নামায আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত পড়ে মাঝে মধ্যে বাদ দিয়েছেন সেগুলোকে السُّنَنُ الزائِدَةُ বা الصلوات المندوبة বলে। সুন্নাতে যায়েদাগুলো এই –

১. আছরের আগে চার রাক'আত ২. এশার আগে চার রাক'আত ৩. এশা পরবর্তী দু'রাক'আতের পর আরো দু'রাক'আত ৪. যোহর-পরবর্তী দু'রাক'আতের পর আরো দু'রাক'আত ৫. মাগরিবের পর তিন সালামে ছয় রাক'আত।

৬. تحية المسجد দু'রাক'আত। ৭. অযু করার পর অযুর অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার আগে تحية الوضوء দু'রাক'আত ৮. صلاة الضُّحٰى চার থেকে বার রাক'আত ৯. রাত্রে ঘুম থেকে জেগে অন্তত দুই রাক'আত ১০. صلاة الاِسْتِخارة দু'রাক'আত ১১. صلاة الحاجة দু'রাক'আত

এ ছাড়া রামাযানের শেষ দশ দিন রাত জেগে নফল পড়া মুস্তাহাব। দুই ঈদের রাত্রে, যিলহজ্জের দশ তারিখের রাত্রে এবং নিছফে শা'বানের রাত্রে জাগরণ করে নফল পড়া মুস্তাহাব।

মসজিদে দাখেল হওয়ার পর মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে বসার আগেই تحية المسجد পড়তে হয়, তবে বসার পরও পড়া যায়।

মসজিদে দাখেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফরয নামায বা অন্য কোন নামায পড়লেও تحية المسجد এর সুন্নাত আদায় হয়ে যায়।

কয়েকটি মাসআলা

১ – ফজরের আগের দু'রাক'আত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

رَكْعَتا الفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدنيا وَ ما فيها

তাই বিনা ওযরে তা বসে পড়া জায়েয নয়। তদ্রূপ যদি ফজরের সঙ্গে তা ফাওত হয়, আর যাওয়ালের আগে কাযা পড়া হয় তাহলে এই সুন্নাতেরও কাযা পড়তে হবে।

তারপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যোহরের আগের চার রাক'আত। তাই যোহরের আগে তা পড়া সম্ভব না হলে যোহরের পরে তা পড়ে নিতে হবে।

২ – নফল নামায এক সালামে দুই বা চার রাক'আত পড়া যায়। তবে চার রাক'আত পড়লে মাঝে তাশাহহুদের বৈঠক করতে হবে। যদি মাঝখানের বৈঠক বাদ দিয়ে শুধু শেষ বৈঠক করে তাহলে মাকরূহ হবে।

৩ – এক সালামে চার রাক'আতের বেশী নফল পড়া যায়, তবে দিনে চার এবং রাতে আট রাক'আতের বেশী এক সালামে পড়া মাকরূহ।

আবু হানীফা (রহ) এর মতে রাতে ও দিনে এক সালামে চার রাক'আত পড়া উত্তম। ছাহেবায়নের মতে দিনে দু'রাক'আত করে এবং রাত্রে চার রাক'আত করে পড়া উত্তম।

৪ – মসজিদে বা অন্য কোন স্থানে রাত্রি জাগরণের জন্য ডাকাডাকি ও আয়োজন করে সমাবেশ করা মাকরূহ, তবে নিজে নিজে সমাবেশ হয়ে গেলে অসুবিধা নেই।

প্রশ্নমালা

১ – السنن المؤكدة ও السنن الزائدة এর পরিচয় বলো।

২ – السنن المؤكدة গুলো আলোচনা করো।

৩ – ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৪ – تحية المسجد সম্পর্কে যা জানো বলো।

৫ – রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে আলোচনা করো।

৬ – এক সালামে কত রাক'আত নফল পড়বে বলো।

তারাবীহ্-এর নামায

০ তারাবীহর নামায প্রত্যেক বালিগ পুরুষ ও নারীর উপর সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। তবে জামা'আতের সাথে তারাবীহ্ পড়া প্রত্যেক মহল্লার জন্য সুন্নাতে কিফায়াহ। অর্থাৎ মহল্লার কিছু লোক জামা'আত করলে সকলের পক্ষ হতে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি জামা'আত না পড়ে তবে মহল্লার সবাই সুন্নাত তরকের গোনাহগার হবে।

০ তারাবীহ্ হলো দশ সালামে বিশ রাক'আত। প্রতি চার রাক'আত পর সেই পরিমাণ সময় বসে বিশ্রাম করা মুস্তাহাব, যদি লোকেরা বিরক্তি বোধ না করে। প্রতি চার রাক'আতকে একটি তারবীহা বলে। পঞ্চম তারবীহা ও বিতিরের মাঝেও বসা মুস্তাহাব।

০ তারাবীহ-এর সময় হলো এশার পর থেকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। বিতিরের আগে তারাবীহ পড়া উত্তম, তবে বিতিরের পরেও পড়া যায়।

রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত বা মধ্যরাত পর্যন্ত তারাবীহকে বিলম্বিত করা মুস্তাহাব। তবে মধ্যরাত্রি থেকে বিলম্ব করলেও মাকরূহ হবে না।

০ পুরো মাসে তারাবীহর নামাযে একবার কোরআন খতম করা সুন্নাত। মুছল্লীদের অলসতার কারণে তা তরক করা ঠিক নয়। তদ্রূপ

মুছল্লীদের কারণে তাড়াহুড়া করা, তাশাহহুদের পর দুরূদ বাদ দেয়া, ছানা ও তাসবীহ বাদ দেয়া ঠিক নয়।

জুমু'আর নামায

০ জুমু'আর দুই রাক'আত জাহরী নামায স্বতন্ত্র ফরয, এটা যোহরের বদল বা স্থলবর্তী নয়। তবে যদি কারো জুমু'আর নামায ফাওত হয়ে যায় তাহলে তার উপর যোহরের চার রাক'আত ফরয হবে।[১]

জুমু'আর নামায ফরয হওয়ার শর্ত হলো –

১. পুরুষ হওয়া ২. স্বাধীন হওয়া ৩. শহরে মুকীম হওয়া ৪. সুস্থ হওয়া ৫. নিরাপদ হওয়া ৬. দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া। ৭. হাঁটতে সক্ষম হওয়া।

সুতরাং স্ত্রীলোকের উপর, গোলামের উপর, অসুস্থ ব্যক্তির উপর, অন্ধের উপর, নিরাপত্তাহীন ব্যক্তির উপর এবং হাঁটতে অক্ষম ব্যক্তির উপর জুমু'আ ফরয নয়।

০ যাদের উপর জুমু'আর নামায ফরয নয় তারা জামা'আতে শরীক হলে তাদের জুমু'আ ছহী হবে এবং যোহর রহিত হয়ে যাবে, বরং তাদের জন্য জুমু'আর নামাযে শরীক হওয়াই উত্তম। তবে স্ত্রীলোকের জন্য বাড়ীতে যোহর আদায় করাই উত্তম।[২]

০ জুমু'আর জামা'আত অনুষ্ঠানের জন্য শর্ত হলো–

১. শহর হওয়া ২. শাসক বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা ৩. সাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থান হওয়া।[৩] ৪. ইমাম ছাড়া তিনজন পুরুষের জামা'আত হওয়া ৫. এবং জামা'আতের উপস্থিতিতে খোতবা দেওয়া।

০ যোহরের সময় হলো জুমু'আর সময়। সুতরাং যোহরের সময়ের আগে বা পরে জুমু'আর জামা'আত করা জায়েয নয়।

---

১. صَلاةُ الجُمُعَةِ ركعَتانِ جَهْرِيَّتانِ، و هي فَرْضُ عَيْنٍ مُسْتَقِلٌّ، و ليس بَدَلاً عَنِ الظهرِ، و لكنَّ مَنْ فاتَتْه الجُمُعَةُ فُرِضَتْ عليه صلاةُ الظهر أربعًا ·

২. لا تَجِبُ الجُمُعَة على مُسافرٍ و لا امرَأةٍ و لا صَبِيٍّ و لا عَبْدٍ و لا أَعْمىٰ، فإن حَضَرُوا و صَلَّوْا معَ الناسِ صَحَّتْ صلاتُهم و سقَط عنهم الظهرُ ·

৩. الإِذْنُ العَامُّ

০ খোতবার সময় হলো জুমু'আর আগে এবং যোহরের সময়ের মধ্যে। সুতরাং যোহরের সময় হওয়ার আগে, কিংবা জুমু'আর নামাযের পরে খোতবা দেওয়া ছহী নয়। খোতবার সুন্নাত এই যে, খতীব পাক অবস্থায় মিম্বরে বসার পর তার সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া হবে। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে খোতবা দেবেন।

খোতবার শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলার হামদ-ছানা, কালিমা শাহাদাত ও দুরূদ পাঠ করবেন, তারপর মানুষকে উপদেশ দেবেন এবং অন্তত একটি আয়াত তেলাওয়াত করবেন।

খতীব পর পর দু'টি খোতবা দেবেন এবং দুই খোতবার মাঝে সামান্য সময় বসবেন। দ্বিতীয় খোতবা হামদ-ছানা ও দুরূদ দ্বারা শুরু করবেন, তারপর মুসলমানদের জন্য দু'আ ও ইসতিগফার করবেন।

০ খতীব খোতবার জন্য মিম্বরে বসার পর নামায পড়া বা কথা বলা নিষেধ। এমনকি সালামের জওয়াব এবং হাঁচির জওয়াব দেয়াও নিষেধ।

০ তুমি যদি তাশাহহুদের অবস্থায় ইমামের সাথে শরীক হতে পারো তাহলে তুমি জুমু'আর জামা'আত পেয়েছো বলে ধরা হবে। সুতরাং ইমামের সালাম ফেরানোর পর তুমি উঠে জুমু'আর দুই রাক'আত আদায় করবে।

কয়েকটি মাসআলা

১ – জুমু'আর প্রথম আযানের সঙ্গে সঙ্গে বেচা-কেনা ও সমস্ত কাজ-কর্ম বন্ধ করে জুমু'আর জন্য রওয়ানা হওয়া ওয়াজিব।

২ – শারী'আতের পরিভাষায় 'শহর' বলে এমন জনপদকে যেখানে বিচারের ব্যবস্থা আছে এবং জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ আছে এবং মাসায়েল জিজ্ঞাসা করার মত আলিম আছেন। যদি তা না থাকে তাহলে সেটা হলো গ্রাম। এমন গ্রামে জুমু'আ পড়া যায় না।[১]

৩ – জুমু'আর দিনের সুন্নাত হলো গোসল করা, খুশবু ব্যবহার করা

১. المِصْرُ الجامِعُ كلُّ مَوْضِعٍ له أميرٌ و قاضٍ يُنَفِّذُ الأحكامَ و يُقِيمُ الحُدودَ و عالِمٌ يَرجِعُ إليه الناسُ في المسائِلِ .

এবং সবচেয়ে সুন্দর কাপড় পরা।

৪ – এক শহরে জুমু'আর একাধিক জামা'আত হতে পারে। তবে বড় বড় মসজিদে এবং খোলা মাঠে জামা'আত করাই উত্তম।

৫ – জুমু'আর জামা'আত ফাওত হয়ে গেলে তার উপর যোহরের নামায ফরয হবে।

৬ – যার কোন ওযর নেই তার জন্য জুমু'আর জামা'আত হওয়ার আগে যোহর পড়া হারাম, আর ওযরওয়ালাদের জন্য জামা'আত শেষ হওয়ার পর যোহর পড়া মুস্তাহাব।

৭ – ওযরওয়ালাদের ক্ষেত্রে জুমু'আর দিন শহরে জামা'আতের সাথে যোহর পড়া মাকরূহ, বরং তারা একা একা যোহর পড়ে নেবে।

প্রশ্নমালা

১ – জুমু'আর নামায ফরয হওয়ার শর্তগুলো আলোচনা করো।

২ – জুমু'আর জামা'আত ছহী হওয়ার শর্তগুলো আলোচনা করো এবং শহরের পরিচয় দাও।

৩ – গ্রামে জুমু'আর হুকুম কী এবং গ্রাম কাকে বলে?

৪ – জুমু'আ শেষ হয়ে গেছে, কিংবা শেষ না হলেও অযু করে গিয়ে ইমামকে শুধু তাশাহহুদে পাওয়া যাবে, এখন কী করণীয়?

৫ – ফেরারী খুনের আসামীর উপর কি জুমু'আ ওয়াজিব? কেন?

৬ – খোতবা চলাকালে গোলযোগ হলো এবং ইমাম ও তিনজন অন্ধলোক শুধু রয়ে গেলো, এখন তাদের কী করণীয় এবং কেন?

৭ – মুসাফির কি জুমু'আর ইমাম ও খতীব হতে পারে?

৮ – জুমু'আর খোতবার সুন্নাত তরীকা বয়ান করো।

৯ – ইমাম অযু ছাড়া এবং বসে খোতবা দিলে কি জুমু'আ হবে?

১০ – জুমু'আর দিনের সুন্নাত কী কী?

দুই ঈদের নামায

প্রত্যেক জাতির উৎসবের দিন আছে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা

হলো মুসলমানদের উৎসবের দিন। ঈদুল ফিতর হলো রামাযানের শেষে শাওয়ালের প্রথম তারিখে, আর ঈদুল আযহা হলো যিলহজ্জের দশ তারিখে। অন্যান্য জাতি তাদের উৎসবের দিনে খেলা-ধূলা, গান-বাজনা ও আমোদ-ফূর্তিতে মেতে ওঠে। আমরা ঈদের জামা'আতে শরীক হয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করি এবং বৈধ উপায়ে আনন্দ করি।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর দেখেন যে, মদীনার লোকেরা দু'টি বিশেষ দিনে আমোদ-ফুর্তি ও খেলা-ধূলা করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ দু'টি কিসের দিন? লোকেরা বললো, জাহেলিয়াতের যুগ থেকে এ দু'দিন আমরা উৎসব এবং খেলা-ধূলা করে থাকি।

তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে এ দু'টি দিনের পরিবর্তে আরো উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন। আর তা হলো ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর।

হিজরতের প্রথম বছর দুই ঈদ প্রবর্তিত হয়েছে।

০ জুমু'আর নামায ফরয, আর ঈদের নামায ওয়াজিব। যাদের উপর জুমু'আর নামায ফরয তাদেরই উপর ঈদের নামায ওয়াজিব। যাদের উপর জুমু'আর নামায ফরয নয় তাদের উপর ঈদের নামাযও ওয়াজিব নয়।

০ জুমু'আ ও ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠানের শর্ত অভিন্ন। তবে ঈদের জামা'আতের জন্য খোতবা শর্ত নয়, সুন্নাত এবং ঈদের খোতবা হয় জামা'আতের পরে। তাছাড়া ইমাম ও একজন মুক্তাদী মিলেই ঈদের জামা'আত হতে পারে।

০ জুমু'আর মত ঈদের নামাযও দু'রাক'আত এবং জাহরী। আর তাতে রয়েছে ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর। তিনটি প্রথম রাক'আতে ثَنَاء এর পর, আর তিনটি দ্বিতীয় রাক'আতে রুকুর আগে। ঈদের ছয় তাকবীর হলো ওয়াজিব, এগুলোকে تَكْبِيراتُ الزوائِد বলে।

ঈদের নামাযের সময় হলো সূর্য তীর পরিমাণ উপরে ওঠার পর থেকে যাওয়ালের আগ পর্যন্ত।[১]

১. إذا ارْتَفَعَ النهارُ دخَلَ وقتُ العِيد إلى الزَّوالِ، فَإذا زالَتِ الشمسُ خرَجَ الوقتُ

এভাবে ঈদের নামায পড়ো

তুমি যদি ঈদের নামায পড়তে চাও তাহলে মসজিদে বা ঈদগাহে যাও এবং ইমামের পিছনে জামা'আতের কাতারে দাঁড়াও। ইমাম যখন তাকবীরে তাহরীমা বলেন তখন তুমিও ঈদের নামাযের নিয়ত করে এবং ইমামের পিছনে ইক্তিদার নিয়ত করে তাহরীমার তাকবীর বলো এবং হাত বাঁধো। তারপর ছানা পড়ো এবং ইমামের সঙ্গে তিনটি তাকবীর বলো। প্রতিবার দুই হাত কানের লতি পর্যন্ত তোলো এবং হাত না বেঁধে সোজা ছেড়ে দাও এবং তারপর হাত বেঁধে চুপ করে থাকো। ইমাম নিঃশব্দে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم এবং بسم الله الرحمن الرحيم পড়বেন। তারপর সশব্দে ফাতিহা পড়বেন এবং ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা যোগ করবেন। তারপর তুমি ইমামের সঙ্গে রুকূ-সিজদা করো, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে করে থাকো।

তারপর ইমামের সঙ্গে দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াও এবং চুপ থাকো। ইমাম নিঃশব্দে بسم الله الرحمن الرحيم পড়বেন, তারপর সশব্দে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন। ক্বিরাআত শেষে ইমামের সঙ্গে তিনটি তাকবীর বলো। প্রতিবার দুই হাত কানের লতি পর্যন্ত তোলো এবং হাত না বেঁধে সোজা ছেড়ে দাও। তারপর ইমাম চতুর্থ তাকবীর বলে রুকূতে যাবেন, তুমিও ইমামের সঙ্গে তাকবীর বলে রুকূতে যাও। তারপর ইমামের সঙ্গে নামায শেষ করো, যেমন পাঁচওয়াক্ত নামাযে করে থাকো।

০ নামাযের পর ইমাম দু'টি খোতবা দেবেন এবং ঈদুল ফিতর হলে মানুষকে ঈদুল ফিতরের আহ্কাম শিক্ষা দেবেন, আর ঈদুল আযহা হলে কোরবানীর আহকাম শিক্ষা দেবেন। জুমু'আর খোতবার মত এখানেও দুই খোতবার মাঝে সামান্য সময় বসবেন।

ঈদুল ফিতরের মুস্তাহাব আমল

ঈদুল ফিতরের দিন মুস্তাহাব হলো–

১ – তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা এবং মহল্লার মসজিদে ফজরের নামায আদায় করা।

২ – মেসওয়াক করা, গোসল করা, খোশবু ব্যবহার করা এবং নিজের সুন্দরতম পোশাকটি পরা।

৩ – তাড়াতাড়ি ঈদগাহে যাওয়া এবং যাওয়ার আগে কিছু খাওয়া।

৪ – ছাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হলে ঈদগাহে যাওয়ার আগে তা আদায় করা এবং সাধ্যমত বেশী পরিমাণে ছাদাকা করা।

৫ – ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া এবং নীচু আওয়াযে তাকবীর বলা। ঈদগাহে পৌঁছার পর তাকবীর বন্ধ করে দেবে এবং নামাযের পর অন্য পথে ফিরে আসবে।

৬ – স্বাভাবিকভাবে ঈদের আনন্দ প্রকাশ করা।

কয়েকটি মাসআলা

১ – ঈদের জামা'আতে আযান ও ইকামত নেই।

২ – খোতবা ছাড়া ঈদের জামা'আত কিংবা জামা'আতের আগে ঈদের খোতবা মাকরূহ।

৩ – উভয় রাক'আতে ক্বিরাআতের আগে تكبيرات الزوائد বলা জায়েয আছে, তবে তা অনুত্তম।

৩ – কোন ওযরের কারণে প্রথম দিন জামা'আত করা সম্ভব না হলে ঈদুল ফিতরের জামা'আত পরের দিন একই সময়ে করা যায় এবং ঈদুল আযহার জামা'আত যিলহজ্জের বার তারিখ পর্যন্ত একই সময়ে করা যায়। তবে কারো ঈদের জামা'আত ফাওত হয়ে গেলে সে একা একা ঈদের নামায পড়তে পারবে না। কেননা ঈদের জন্য জামা'আত হলো শর্ত।

৪ – ঈদুল আযহার নামায ঈদুল ফিতরেরই মত, তবে ঈদুল আযহায় নামাযের আগে কিছু না খাওয়া সুন্নাত এবং পথে জোরে জোরে তাকবীর বলা সুন্নাত।

৫ – তাকবীরে তাশরীকের দিন হলো নয় তারিখের ফজর থেকে তের তারিখের আছর পর্যন্ত। এ কয়দিন প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার সশব্দে তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। নারী-পুরুষ,

মুকীম-মুসাফির ও শহর-গ্রাম সকলেরই উপর তা ওয়াজিব। জামা'আতের সঙ্গে নামায পড়ুক, কিংবা একা।

তাকবীরে তাশরীক এই –

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، و الله أكبر، الله أكبر و لله الحمد

৬ – ঈদের নামাযের আগে বাড়ীতে ও ঈদগাহে নফল পড়া মাকরূহ, আর নামাযের পর ঈদগাহে নফল পড়া মাকরূহ হলেও বাড়ীতে পড়া মাকরূহ নয়।

প্রশ্নমালা

১ – দুই ঈদ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করো।

২ – ঈদের নামায কার কার উপর ওয়াজিব এবং ওয়াজিব নয়, বিস্তারিত আলোচনা করো।

৩ – ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠানের শর্তগুলো বিস্তারিত বলো।

৪ – জুমু'আ বা ঈদে ইমাম খোতবা দিতে ভুলে গেলে কী হুকুম?

৫ – تكبيرات الزوائد কী এবং তা আদায়ের তরীকা কী ?

৬ – ইমাম তাকবীরাতে যায়েদা বলতে ভুলে গেলে কী হুকুম?

৭ – ভীষণ বৃষ্টিতে বা শত্রুর ভয়ে প্রথম দিন ঈদের জামা'আত করা না গেলে কী করণীয়?

৮ – ঈদের জামা'আত আদায় করে দেখাও

৯– ঈদুল ফিতরের মুস্তাহাবগুলো আলোচনা করো।

সফরের নামায

০ শারীআতের পরিভাষায় সফর মানে কমপক্ষে আঠারো 'ফারসাখ' দূরে যাওয়ার নিয়ত করা এবং নিজের এলাকার বাড়ী-ঘরের সীমানা পার হয়ে যাওয়া। আধুনিক হিসাবে আঠারো ফারসাখ হলো প্রায় ৭৯ কিলোমিটার। সুতরাং এ দু'টি শর্ত ছাড়া সফরের বিধান সাব্যস্ত হবে না। প্রথমত সফরের দূরত্বে যাওয়ার নিয়ত করা, দ্বিতীয়ত নিজের এলাকার বাড়ী-ঘরের সীমানা পার হওয়া।

সফরের বিধান এই–

১ – মুসাফির কছরের নামায পড়বে। অর্থাৎ চার রাকাতী ফরয দুই রাক'আত পড়বে।

২ – রামাযানে রোযা রাখা না রাখার এখতিয়ার থাকবে। যদি রোযা রাখে তো ভালো, না রাখলে পরে কাযা করবে।

৩ – জুমু'আ ও ঈদের নামায এবং কোরবানীর وُجوب রহিত হবে।

৪ – স্বামী বা মাহরাম ছাড়া স্ত্রীলোকের সফর করা হারাম হবে।

৫ – মোযার উপর মাসাহ করার মুদ্দত একদিন একরাত্রির পরিবর্তে তিনদিন তিনরাত্র হবে।

চার রাকাতী নামায কছর করা মুসাফিরের উপর ওয়াজিব। সুতরাং দু'রাক'আতের পরিবর্তে চার রাক'আত পড়লে সে গোনাহগার হবে। ফজরে ও মাগরিবে কছর নেই, সুতরাং একই নিয়মে দু'রাক'আত এবং তিন রাক'আত পড়তে হবে।

০ সফর বা ইকামাতের নিয়তের ক্ষেত্রে মূল ব্যক্তির নিয়তই গ্রহণযোগ্য, অনুগত ব্যক্তির নিয়ত গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং স্বামী যদি সফরের নিয়ত করে এবং স্ত্রীকে নিয়ে নিজের এলাকার বাড়ী-ঘরের সীমানা পার হয়ে যায় তাহলে স্ত্রী নিয়ত না করলেও মুসাফির হয়ে যাবে। মনিব ও কর্মচারীর ক্ষেত্রেও একই কথা।

০ সফর যে উদ্দেশ্যেই হোক তাকে মুসাফির ধরা হবে। সুতরাং জিহাদের এবং ব্যবসায়ের সফরে যেমন কছর পড়া হবে তেমনি খেলা-ধূলার সফর এবং গোনাহের সফরেও কছর পড়া হবে।[১]

০ সফরের বিধান জারি থাকবে এবং মুসাফির কছর পড়তে থাকবে যতক্ষণ না সে ফিরে এসে নিজের বস্তির সীমানায় প্রবেশ করে, কিংবা বাস-উপযোগী কোন জনপদে কমপক্ষে পনের দিন থাকার নিয়ত করে। পনের দিনের কম সময় থাকার নিয়ত করলে মুকীম হবে না। তদ্রূপ বাস-অনুপযোগী স্থানে থাকার নিয়ত করলেও মুকীম হবে না।

সুতরাং তুমি যদি 'আজ যাবো, কাল যাবো' করে কোন শহরে কয়েক

---

১. العاصِي وَ المُطِيع في السفَر في الرُّخْصَةِ سَواءٌ

বছরও থেকে যাও, তদ্রূপ যদি পানির জাহাজে বা মরুভূমিতে পনের দিনের বেশীও থাকার নিয়ত করো তবু তুমি মুসাফির হবে এবং তোমাকে কছরই পড়তে হবে।

وَطَنُ الإقامَةِ এবং الوَطَنُ الأَصْلِيُّ

০ মানুষ যে বস্তিতে জন্মগ্রহণ করে বা স্থায়ীভাবে বসবাস করে সেটা হলো তার الوطن الأصلي। আর যেখানে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে, হোক পনের দিন বা বছর দু'বছর বা দশ বছর সেটা হলো তার وطن الإقامة

০ মুসাফির যখন সফর থেকে তার وطن أصلي তে ফিরে আসে তখন ইকামতের নিয়ত না করলেও মুকীম হয়ে যায়।

০ তুমি যদি তোমার وطن أصلي ত্যাগ করে অন্য শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করো তখন সেটাই হবে তোমার وطن أصلي – আগের ওয়াতানে আছলী বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং তুমি যদি তোমার আগের وطن أصلي তে পনের দিনের কম সময়ের জন্য বেড়াতে যাও তাহলে সেখানে তুমি মুসাফির হবে এবং তোমাকে কছর পড়তে হবে।

০ তুমি যদি তোমার وطن الإقامة থেকে সফর করো বা আরেকটি وطن الإقامة গ্রহণ করো বা তোমার وطن أصلي তে ফিরে আসো তাহলে আগের وطن الأقامة বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং আগের وطن الأقامة-এ অল্প সময়ের জন্য ফিরে এলে তোমাকে কছর পড়তে হবে।[১]

মুকীম-মুসাফির পরস্পরের ইক্‌তিদা

০ মুসাফির যদি মুকীমের পিছনে ইক্‌তিদা করে তাহলে ইমামকে অনুসরণ করে সে চার রাক'আত পুরা আদায় করবে।

মুকীম মুসাফিরের পিছনে ইক্‌তিদা করতে পারে। তখন মুসাফির ইমামের কর্তব্য হলো নামায শুরু করার আগে এ কথা ঘোষণা করা যে, আমি মুসাফির হিসাবে দু'রাক'আত পড়বো। সুতরাং আপনারা আমার

---

১. الوَطَنُ الأَصْلِيُّ يَبْطُل بِوَطَنٍ أصليٍّ آخَرَ و لا يَبْطُل بوَطَنِ الإقامَةِ، و وَطَنُ الإقامَةِ يبطُل بالوطَنِ الأصليِّ و بِوَطَنِ إقامَةٍ آخَرَ.

সালাম ফেরানো পর উঠে বাকি দু'রাক'আত পড়ে নেবেন। সালাম ফেরানোর পরও এ ঘোষণা দেবে।

০ মুসাফির অবস্থায় চার রাকাতী নামায ফাওত হলে সফরে বা হযরে যখনই আদায় করা হোক কছররূপে আদায় করতে হবে। আর মুকীম অবস্থায় ফাওত হলে যখনই আদায় করা হোক চার রাক'আতই আদায় করতে হবে।

কয়েকটি মাসআলা

১ – সফরের সর্বনিম্ন দূরত্ব সম্পর্কে মূল কথা এই যে, বছরের সবচে' ছোট তিন দিনে সাধারণভাবে পায়ে হেঁটে বা উটের পিঠে চড়ে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করা যায় সেটাই হলো সফরের সর্বনিম্ন পরিমাণ। বিষয়টিকে সহজ করার জন্য ফকীহগণ হিসাব করে আঠারো 'ফারসাখ' বা ৭৯ কিলোমিটার নির্ধারণ করেছেন।[১]

২ – তুমি যদি গাড়ী, ট্রেন ও বিমানের মত দ্রুতযানে তিন দিনের দূরত্ব সামান্য সময়ে অতিক্রম করো তবু তোমার উপর কছর ওয়াজিব হবে।

৩ – কছর ওয়াজিব হবে, না পূর্ণ নামায ওয়াজিব হবে তা নির্ভর করবে নামাযের শেষ ওয়াক্তের অবস্থার উপর। শেষ ওয়াক্তে মুসাফির হলে দু'রাক'আত ওয়াজিব হবে, আর শেষ ওয়াক্তে মুকীম হলে পূর্ণ নামায ওয়াজিব হবে।

৪ – সফর আরামের হলে এবং ঝামেলা ও পেরেশানিমুক্ত পরিবেশ হলে মুসাফিরের কর্তব্য হবে সুন্নাত নামাযগুলো আদায় করা। আর তাড়াহুড়া ও ঝামেলার পরিস্থিতি হলে সুন্নাত আদায় করার দরকার নেই।

৫ – সফরের অবস্থায় চার রাক'আত নামায পড়লে দু'রাক'আতই শুধু ফরয হবে, বাকি দু'রাক'আত হবে নফল। সুতরাং যদি

---

১. السَفَرُ الذي يتغَيَّر به الأحكامُ أن يَقْصِدَ الإنسانُ مَسِيرَةَ ثلاثةِ أيامٍ بِسَيْرِ الإبلِ و مَشْيِ الأقدامِ .

দু'রাক'আত পর তাশাহহুদের জন্য বসা হয় তাহলে নামায ছহী হবে, আর বসা না হলে নামায ছহী হবে না। কেননা এটা ছিলো আখেরী বৈঠক, যা ফরয। আর ফরয তরক করলে নামায হয় না।

৬ – যদি উদ্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার দু'টি পথ থাকে এবং এক পথের দূরত্ব হয় ৭৯ কিলোমিটার, আর অন্য পথের দূরত্ব হয় কম তাহলে যে পথে সফর করবে সে পথের দূরত্বই বিবেচ্য হবে। সুতরাং প্রথম পথে সফর করলে তুমি মুসাফির হবে, দ্বিতীয় পথে সফর করলে মুসাফির হবে না।

প্রশ্নমালা

১ – সফরের সর্বনিম্ন দূরত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।

২ – শারী'আতের পরিভাষায় মুসাফির কাকে বলে?

৩ – সফরের কারণে কী কী বিধান সাব্যস্ত হয়?

৪ – একজন হজ্জের সফরে গেলো, আরেকজন গেলো পর্যটকরূপে বিদেশ ভ্রমণে, আর তৃতীয়জন? সে গেলো দূরে এক শহরে ডাকাতি করতে, এই তিনজনের কে কে কছর করবে এবং কেন করবে বলো।

৫ – সফর ও ইকামাতের ক্ষেত্রে মূলব্যক্তির নিয়ত গ্রহণযোগ্য, একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝাও।

৬ – একজন লোক সফরের দূরত্ব অতিক্রম করলো, কিন্তু মুসাফির হলো না, আবার একজন মুসাফির এক শহরে পনের দিন থাকলো, কিন্তু মুকীম হলো না, বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

৭ – মুসাফির কখন মুকীম হয় আলোচনা করো।

৮ – الوطن الأصلي এবং وطن الإقامة কাকে বলে এবং কোন্‌টি দ্বারা কোন্‌টি ভেঙ্গে যায় উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলো।

৯ – একজন যোহরের চার রাক'আত পড়ে সফরে বের হলো, এবং পথে আছরের নামায কছর পড়লো, তারপর কোন প্রয়োজনে আছরের ওয়াক্তে বাড়ী ফিরে এলো, তখন দেখা গেলো যে, সে

যোহর ও আছর তাহারাত ছাড়া পড়েছে। তখন সে অযু করে যোহরের কাযা পড়লো দুই রাক'আত, আর আছর আদায় করলো চার রাক'আত। এর ভিত্তি কী? ব্যাখ্যা করে বোঝাও।

১০ – একই স্থান থেকে তুমি নৌপথে এবং তোমার বন্ধু সড়ক পথে একটি শহরে গিয়েছো। তোমার উপর কছর ওয়াজিব হলো, কিন্তু তোমার বন্ধুর উপর কছর ওয়াজিব হলো না; বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

১১ – মুসাফির ও মুকীম পরস্পরের পিছনে ইক্‌তিদার হুকুম বলো।

অসুস্থ ব্যক্তির নামায

শারী'আতের দৃষ্টিতে নামাযের এত গুরুত্ব যে, কঠিন অসুখেও নামায তরক করা জায়েয নয়, তবে শারী'আত তোমাকে এমন কোন আদেশ করে নি যা পালন করতে তুমি অক্ষম, কিংবা তোমার জন্য কষ্টকর। আল্লাহ বলেছেন– لا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا (আল্লাহ কোন মানুষকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত আদেশ করেন না।)

০ এজন্য শারী'আত অসুস্থ ব্যক্তির নামায আদায়কে সহজ করে দিয়েছে। সুতরাং যদি কেউ অসুস্থতার কারণে দাঁড়াতে না পারে, কিংবা দাঁড়ালে অসুস্থ হয়ে পড়ার বা অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার বা আরোগ্য বিলম্বিত হওয়ার আশংকা থাকে, কিংবা দাঁড়াতে খুব কষ্ট হয়, মাথা ঘোরায় – এসব অবস্থায় সে বসে রুকূ-সিজদা করে নামায আদায় করতে পারে। বসার ক্ষেত্রেও যেভাবে বসলে আরাম হয় সেভাবেই বসতে পারে।

০ যদি বসতে পারে কিন্তু রুকূ-সিজদা করতে না পারে তাহলে বসে মাথার ইশারায় রুকূ-সিজদা আদায় করবে। আর সিজদায় রুকূর চেয়ে মাথা বেশী নীচু করবে, যেন রুকূ ও সিজদা আলাদা বোঝা যায়। অন্যথায় নামায ছহী হবে না।[১]

০ যদি বসতেও না পারে তাহলে পা কেবলার দিকে করে চিত হয়ে

---

১. إذا عَجَز المريضُ عَنِ القِيَامِ أو خَافَ زِيادَةَ المَرَضِ صَلّى قاعِدًا يركَع و يسجُد، فإن لَمْ يستَطِعِ الركوعَ و السُّجودَ أوْمَأَ قاعِدًا، فإن لم يستَطِعِ القُعودَ أوْمَأَ مُسْتَلْقِيًا أو على جَنْبِه .

শুয়ে মাথার ইশারায় রুকূ-সিজদা করবে। (পা দু'টো হাঁটু ভেঙ্গে খাড়া রাখা উত্তম, বিনা ওযরে কিবলার দিকে পা ছড়িয়ে দেয়া মাকরূহ।) আর নীচে বালিশ দিয়ে মাথাটা একটু উঁচু করে রাখবে, যাতে রুকূ-সিজদার ইশারা করা সহজ হয় এবং চেহারা কিবলামুখী হয়।

যদি চিত হওয়া সম্ভব না হয় এবং কাত হওয়া সম্ভব হয় তাহলে উত্তর-দক্ষিণে ডান কাত হয়ে, চেহারা কিবলামুখী করে নামায আদায় করবে। তবু নামায মাফ হবে না। শারী'আতে নামায এতই গুরুত্বপূর্ণ।

অসুস্থতার নামাযের দলীল এই যে, হযরত 'ইমরান বিন হাছীন যখন অসুস্থ হলেন তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন–

صَلِّ قائمًا ، فإن لم تَستَطِعْ فقاعِدًا ، فإن لم تستَطِعْ فَعَلى الجَنْبِ تُومِي إيماءً

(رواه أبو داؤد)

০ যদি মাথা নেড়ে ইশারা করাও সম্ভব না হয় তাহলে চোখের বা মনের ইশারায় নামায আদায় হবে না; বরং তার একদিন ও একরাত্রের নামায স্থগিত থাকবে। যখন সক্ষমতা ফিরে আসবে তখন তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি এ অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্তের বেশী কাযা হয়ে যায় তাহলে তা আদায় করতে হবে না। কেননা তা বান্দার জন্য কষ্টকর।

০ যদি কেউ বিকৃতমস্তিষ্ক বা বেহুঁশ হয়ে পড়ে এবং কাযা নামায পাঁচ ওয়াক্ত বা তার কম হয় তাহলে সুস্থ হওয়ার পর তা কাযা করতে হবে; পাঁচ ওয়াক্তের বেশী হলে কাযা করতে হবে না।

কয়েকটি মাসআলা

১ – যদি কোন কিছুর সাথে হেলান দিয়ে বা কোন মানুষের সাহায্য নিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হয়, আর সে সাহায্য করতে রাজী হয় তাহলে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে হবে।

২ – যদি জামা'আতের জন্য হেঁটে মসজিদে গেলে দাঁড়ানো সম্ভব না হয় তাহলে ঘরেই দাঁড়িয়ে নামায পড়বে।

৩ – নামাযের মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়লে নামায ভঙ্গ না করে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে যেভাবেই পারে বাকি নামায আদায় করবে।

৪ – যদি বসে রুকূ-সিজদাকারী ব্যক্তি নামাযের মাঝে সুস্থ্ হয়ে যায় তাহলে বাকি নামায সুস্থ্ ব্যক্তির মত শেষ করবে। আর যদি বসে বা শুয়ে ইশারায় রুকূ-সিজদাকারী ব্যক্তি সুস্থ্ হয়ে যায় তাহলে নামায নতুনভাবে শুরু করবে।

৫ – চিকিৎসক যদি অষুধ প্রয়োগ করে ছয় ওয়াক্তের বেশী অজ্ঞান করে রাখে তাহলে নামায রহিত হয়ে যাবে। এর কম হলে কাযা করতে হবে।

৬ – যদি নেশা করে বেহুঁশ হয়ে থাকে তাহলে কাযা নামাযের সংখ্যা যতই হোক মাফ হবে না, বরং তা কাযা করতে হবে।

প্রশ্নমালা

১ – অসুস্থ্ ব্যক্তি কীভাবে নামায আদায় করবে এবং তার প্রমাণ কী?

২ – একজন অসুস্থ্ ব্যক্তি দাঁড়াতে বা বসতে সক্ষম নয়, তা কখন বোঝা যাবে, বলো।

৩ – একজন অসুস্থ্ হয়ে, একজন মদ খেয়ে তিন দিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকলো, আরেকজনকে চিকিৎসার প্রয়োজনে তিনদিন অজ্ঞান করে রাখা হলো। এদের নামাযের হুকুম কী?

৪ – নামাযের জন্য অসুস্থ্ ব্যক্তির চিত হয়ে এবং কাত হয়ে শোয়ার ছূরত বলো।

৫ – নামাযের মাঝে অসুস্থ্ হয়ে পড়লে, কিংবা অসুস্থ্ ব্যক্তি নামাযের মাঝে সুস্থ্ হয়ে গেলে তার কী করণীয়, বলো।

৬ – অসুস্থ্তা এত গুরুতর যে, মাথার ইশারায় রুকূ-সিজদা করা সম্ভব হচ্ছে না, এ ক্ষেত্রে শারী'আতের কী হুকুম, বলো।

কাযা নামায পড়া

প্রথমে أداء ও قضاء শব্দ দু'টির অর্থ জেনে নাও। أداء অর্থ কোন আমলকে তার নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা, আর قضاء অর্থ কোন আমলকে তার নির্ধারিত সময়ের পরে পালন করা। যেমন যোহরের নামাযকে যদি যোহরের সময়ে পড়ো তাহলে তুমি যোহরের নামায আদায়

করলে, আর যদি যোহরের সময়ে না পড়ে আছরের সময়, বা অন্য কোন সময় পড়ো তাহলে তুমি যোহরের নামায কাযা করলে। বাংলায় অবশ্য কাযা করার অর্থ আমরা বুঝি, ঠিক সময়ে না পড়া। যেমন রাশেদ যোহরের নামায কাযা করেছে। অর্থাৎ যোহরের সময় যোহরের নামায পড়ে নি।

০ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করা ওয়াজিব। বিনা ওযরে নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় না করা কাবীরা গোনাহ, ওযর হলে অবশ্য গোনাহ হবে না। তবে উভয় ছূরতেই ঐ নামায কাযা করতে হবে।

০ নিষিদ্ধ তিন সময় ছাড়া জীবনের যে কোন সময় কাযা পড়া যায়, তবে কাযা নামায যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পড়ে নেয়া ওয়াজিব।

০ ফরয নামাযের কাযা পড়া ফরয এবং ওয়াজিব নামাযের কাযা পড়া ওয়াজিব। সুন্নাত ও নফল নামাযের কাযা নেই। তবে ফজরের সুন্নাত ফজরের সঙ্গে 'কাযা' হলে এবং যাওয়ালের আগে পড়লে সুন্নাতেরও কাযা পড়তে হবে। যাওয়ালের পরে পড়লে সুন্নাতের কাযা পড়া যাবে না। তদ্রূপ শুধু ফজরের সুন্নাত 'কাযা' হলে তার কাযা পড়া যাবে না।

০ নফল শুরু করার পর ভেঙ্গে ফেললে তার কাযা পড়া ওয়াজিব।

নামাযের তারতীব

০ ওয়াক্তিয়া ও কাযা নামাযের মাঝে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। সুতরাং ফজরের কাযা না পড়ে যোহর আদায় করা জায়েয হবে না। তদ্রূপ বিতিরের কাযা না পড়ে ফজর আদায় করা জায়েয হবে না।[১]

০ কয়েক ওয়াক্ত কাযা হলে কাযা নামাযগুলোর মাঝেও তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। সুতরাং যদি ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা কাযা হয়ে যায় তাহলে আগে ফজর, তারপর যোহর, তারপর আছর, তারপর মাগরিব, তারপর এশার কাযা পড়বে। তারপর ফজর আদায় করবে।[২]

---

১. وَ مَنْ فاتَتْه صلاةٌ قضاها إذا ذَكَرَهَا، و قَدَّمَها على صَلاة الوَقْتِ .

২. و مَنْ فاتَتْه صَلَواتٌ رَتَّبَهَا في القَضاءِ كما وَجَبَتْ في الأَصْلِ و إن زَادَتِ الفَوائتُ على خَمْسِ صَلَواتٍ، سقَط الترتيبُ فيها، كَمَا يسقُط بَيْنَهَا و بينَ الوقتيَّةِ .

০ তিন কারণের যে কোন একটি কারণ ঘটলে তারতীবের وجوب রহিত হয়ে যায়। যথা–

১. সময় এত সংকীর্ণ হয়ে পড়া যে, কাযা নামায পড়তে গেলে ওয়াক্তিয়া নামায কাযা হয়ে যাবে। (তখন আগে ওয়াক্তিয়া আদায় করে তারপর কাযা পড়বে। কাযা পড়তে গিয়ে ওয়াক্তিয়া নামায ফাওত করা জায়েয নয়।)

২. কাযা নামাযের কথা ভুলে গিয়ে ওয়াক্তিয়া আদায় করা (এক্ষেত্রে ওয়াক্তিয়া আদায় হয়ে যাবে।)

৩ . বিতির ছাড়াই কাযা নামাযের সংখ্যা পাঁচের বেশী হয়ে যাওয়া। (তখন তারতীবের وجوب রহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ কাযাগুলো পড়ার আগেই ওয়াক্তিয়া পড়া যাবে এবং কাযা নামাযও তারতীব ছাড়া পড়া যাবে।)

০ কাযা নামাযের সংখ্যা যখন কমে আসবে তখন দ্বিতীয় বার তারতীব ফিরে আসবে না। যেমন দশ ওয়াক্ত থেকে ছয় ওয়াক্ত কাযা পড়া হয়ে গেলো। তখন বাকি কাযা না পড়েও ওয়াক্তিয়া পড়া যাবে এবং কাযাগুলোও বে-তরতীব পড়া যাবে। কেননা তারতীবের وجوب আগেই রহিত হয়ে গিয়েছে।

০ কাযা নামাযের সংখ্যা যদি কম হয় এবং মনে রাখা সম্ভব হয় তাহলে কাযা পড়ার সময় নির্দিষ্ট করে নিয়ত করতে হবে যে, অমুক দিনের অমুক ওয়াক্তের নামাযের কাযা পড়ছি।

যদি কাযা নামাযের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে মনে রাখা সম্ভব নয় তাহলে এভাবে নিয়ত করবে যে, যত ফজর কাযা হয়েছে তার সর্বপ্রথম বা সর্বশেষটির কাযা পড়ছি। অন্যান্য ওয়াক্ত সম্পর্কেও একই কথা।

কয়েকটি মাসআলা

১ – নফল নামায ও অন্যান্য নফল ইবাদতের পরিবর্তে কাযা নামায পড়া অধিক উত্তম। অবশ্য সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং যে সকল নামাযের কথা হাদীছ শরীফে এসেছে সেগুলো পড়া যায়। যেমন তাহিয়্যাতুল অযু, তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও চাশতের নামায।

২ – ফরয নামায সময়মত আদায় না করার ওযর হলো–

(ক) শত্রুর এমন প্রচণ্ড হামলা হওয়া যে, দাঁড়িয়ে বসে ও চলা

অবস্থায় কোনভাবেই নামায আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না, এমনকি কিবলামুখী না হয়েও আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না।

(খ) অসুস্থতার কারণে মাথার ইশারায়ও রুকূ-সিজদা করা সম্ভব না হওয়া।

(গ) অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের এমন আশংকা প্রকাশ করা যে, নামাযের জন্য নড়া-চড়ায় অসুস্থতা বেড়ে যাবে

৩ – এক ওয়াক্ত নামায 'কাযা' হওয়ার পর যদি মনে থাকা সত্ত্বেও এবং সময় থাকা সত্ত্বেও তা কাযা করার আগে এক দুই করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে ফেলে তাহলে পাঁচ ওয়াক্তের ফরয স্থগিত থাকবে। যদি এ অবস্থায় পঞ্চম ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় তাহলে পাঁচ ওয়াক্তের ফরয আদায় হয়ে যাবে এবং তারতীব রহিত হয়ে যাবে।

আর যদি পঞ্চম ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগে 'কাযা' নামাযটি পড়ে ফেলে তাহলে পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নষ্ট হয়ে যাবে এবং নামাযগুলো নফল বলে গণ্য হবে। সুতরাং ওয়াক্তিয়া নামায পড়ার আগে পিছনের পাঁচ ওয়াক্ত তারতীবসহ কাযা পড়তে হবে।

প্রশ্নমালা

১ – أداء ও قضاء এর পরিচয় উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলো। বাংলায় আমরা কাযা বলতে কী বুঝি?

২ – যেহেতু ঈদের নামায ওয়াজিব এবং জুমু'আর নামায ফরয সেহেতু ঈদের নামাযের কাযা হলো ওয়াজিব এবং জুমু'আর নামাযের কাযা হলো ফরয – এ সম্পর্কে তোমার কী মত?

৩ – দু'ব্যক্তির ফজর কাযা হলো এবং তারা ফজরের কাযা না পড়েই যোহর আদায় করলো। একজনের যোহর আদায় হয়ে গেলো, একজনের যোহর আদায় হলো না, এর কারণ ব্যাখ্যা করো।

৪ – তারতীবের وجوب রহিত হওয়ার কারণ তিনটি বলো?

৫ – একজনের ফজর 'কাযা' রয়েছে, সেটা তার মনেও আছে এবং

সময়ও আছে, এ অবস্থায় সে তারতীব রক্ষা না করে যোহর পড়লো এবং ছহীও হলো– এটা কীভাবে সম্ভব, ব্যাখ্যা করো।

৬ – তারতীব রহিত হওয়ার পর কাযা নামাযের সংখ্যা কমে গেলে দ্বিতীয়বার তারতীব ফিরে আসে না; উদাহরণ দাও।

৭ – আদায় করা ফরয নামাযের ফরযিয়ত স্থগিত থাকার মাসআলাটির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করো।

সাহূর সিজদা

০ নামাযের কিছু কিছু ভুলের ক্ষতিপূরণের জন্য সাহূ সিজদার বিধান রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে মূলকথা এই যে, ভুলে বা ইচ্ছাক্রমে নামাযের কোন রোকন ছেড়ে দিলে নামাযই বাতিল হয়ে যায়, সাহূ সিজদায় তার ক্ষতিপূরণ হয় না, বরং নতুনভাবে নামায পড়া ফরয।

নামাযের কোন ওয়াজিব ইচ্ছাক্রমে ছেড়ে দিলে নামায ফাসিদ হয়ে যায়, সাহূ সিজদায় তার ক্ষতিপূরণ হয় না, বরং নামায দোহরানো ওয়াজিব।

০ যদি ভুলক্রমে নামাযের কোন ওয়াজিব ছেড়ে দেয়, কিংবা নামাযের ফরযে কোন পরিবর্তন ঘটায় তাহলেই শুধু সাহূ সিজদা ওয়াজিব হবে এবং তা দ্বারা নামাযের ক্ষতিপূরণ হবে। সুতরাং–

১. যদি ফরযের প্রথম দুই রাক'আতে ক্বিরাআত পড়া ভুলে যায় এবং শেষ দুই রাক'আতে তা আদায় করে তাহলে নামায হয়ে যাবে এবং সাহূ সিজদা ওয়াজিব হবে। কেননা ফরযের যে কোন দুই রাক'আতে ক্বিরাআত পড়া হলো ফরয, আর প্রথম দুই রাক'আতে পড়া হলো ওয়াজিব।

২. যদি নফল ও বিতিরের কোন এক রাক'আতে এবং ফরযের প্রথম দুই রাক'আতে বা এক রাক'আতে ফাতিহা ভুলে যায়, কিংবা ফাতিহার সঙ্গে সূরা মেলাতে ভুলে যায় তাহলে সাহূ সিজদা ওয়াজিব হবে।

৩. যদি ফাতিহা দুই বার পড়ে তাহলে সূরাকে বিলম্বে যুক্ত করার কারণে সাহূ সিজদা ওয়াজিব হবে।

৪. যদি কোন রাক'আতে ভুলে এক সিজদা দিয়ে পরবর্তী রাক'আতে

চলে যায় এবং সেখানে তিন সিজদা দেয় তাহলে নামায ছহী হয়ে যাবে, তবে সাহূর সিজদা ওয়াজিব হবে।

৫. নফল, বিতির বা ফরযের প্রথম বৈঠক ভুলে গেলে সাহূর সিজদা ওয়াজিব হবে।

৬. যদি তাশাহহুদ পড়া ভুলে যায় কিংবা রুকূর আগে বিতিরের কুনূত পড়া ভুলে যায়, কিংবা কুনূতের তাকবীর ভুলে যায় তাহলে সাহূর সিজদা ওয়াজিব হবে।

৭. ইমাম যদি ভুলে জাহরী নামাযে সিররী ক্বিরাআত পড়েন, কিংবা সিররী নামাযে জাহরী ক্বিরাআত পড়েন তাহলে সিজদা ওয়াজিব হবে।

৮. তুমি যদি প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দুরূদ পড়ো, কিংবা এক রোকন পরিমাণ সময় নীরবে বসে থাকো তাহলে তোমার উপর সাহূর সিজদা ওয়াজিব হবে।

সাহূ সিজদার ছূরত

০ সাহূ সিজদা ওয়াজিব হলে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর ডান দিকে একটি সালাম দেবে এবং তাকবীর বলে নামাযের মত দু'টি সিজদা করবে। তারপর বসে ওয়াজিব তাশাহহুদ পড়বে এবং দুরূদ পড়বে এবং নিজের জন্য দু'আ করবে। তারপর ডানে ও বামে নামায থেকে বের হওয়ার সালাম দেবে।

তাশাহহুদের পর যদি সালাম না ফিরিয়ে সাহূর সিজদায় চলে যায় তাহলে নামায তো হয়ে যাবে, তবে মাকরূহে তানযীহী হবে।

০ ফরয বা ওয়াজিব তরক হলে নামাযের ভিতরে থাকা অবস্থায় যথাসম্ভব তা কাযা করতে হবে। যদি মনে না পড়ে এবং নামায থেকে বের হয়ে যায় তাহলে ফরযের ক্ষেত্রে নামায বাতিল হয়ে যাবে, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে বাতিল হবে না।

নামাযের মাঝে সন্দেহের মাসআলা

০ নামাযের মাঝে যদি সন্দেহ আসে এবং চিন্তা করে সন্দেহ দূর করে, কিন্তু চিন্তা এক রোকন পরিমাণ দীর্ঘ হয়ে যায় তাহলে পরবর্তী ফরয বা

ওয়াজিব বিলম্বিত হওয়ার কারণে সাহূর সিজদা ওয়াজিব হবে। চিন্তার পরিমাণ এক রোকনের কম হলে সিজদা ওয়াজিব হবে না। কেননা এতটুকু চিন্তা না করে উপায় থাকে না।

০ যদি নামাযের মাঝে রাকা'আত সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হয় এবং এ সন্দেহ পিছনে এক দু'বার মাত্র হয়ে থাকে তাহলে নামায বাতিল হয়ে যাবে এবং নতুন করে নামায শুরু করতে হবে।[১]

যদি এ সন্দেহ পিছনে বারবার হয়ে থাকে এবং অভ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে তাহলে তার প্রবল ধারণার উপর আমল করবে। যদি কোন সংখ্যার উপর প্রবল ধারণা না হয় তাহলে কম সংখ্যার উপর আমল করবে এবং এমন প্রত্যেক রাক'আতের পর বসবে যেটা শেষ রাক'আত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর সাহূর সিজদা দেবে। নামায শেষ হওয়ার পর রাক'আত-সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ হলে নামায বাতিল হবে না।

০ নামায শেষ হওয়ার পর যদি নিশ্চিত হয় যে, কোন রাক'আত ছুটে গেছে তাহলে নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ না করা পর্যন্ত ঐ রাক'আত পড়ে নেবে। আর নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ করে থাকলে[২] পুনরায় নামায পড়ে নেবে।

শেষ রাক'আতের পর দাঁড়ানো

০ যদি তুমি শেষ বৈঠক ভুলে অতিরিক্ত রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যাও আর সিজদায় যাওয়ার আগে মনে পড়ে যায় তাহলে তোমার কর্তব্য হলো শেষ বৈঠকে ফিরে আসা এবং সাহূর সিজদা দেয়া।

আর যদি রাক'আতের সিজদা দিয়ে ফেলো তাহলে তোমার ফরয বাতিল হয়ে যাবে এবং নামাযটি নফল হয়ে যাবে। এখন আরেক রাক'আত যোগ করে নাও, যাতে এ দুই রাক'আতও নফল হয়ে যায়। তবে সাহূর সিজদা ওয়াজিব হবে না।

---

১. مَنْ شَكَّ في صَلاتِه فَلَمْ يَدْرِ أ ثلاثًا صَلّى أم أربعًا و ذلك أوَّلُ ما سَهَا، اسْتَقْبَلَ، فإن كان يَعرِضُ له هذا الشكُّ كثيرًا بَنَىٰ على ظَنِّه الغالِبِ .

২. যেমন কথা বলা বা কিবলা থেকে ফিরে যাওয়া।

০ তুমি যদি ফরযের বা বিতিরের প্রথম বৈঠক ভুলে সোজা দাঁড়িয়ে যাও তাহলে বৈঠকে ফিরে না এসে স্বাভাবিক নিয়মে নামায শেষ করবে এবং সাহূর সিজদা দেবে। সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরও যদি বৈঠকে ফিরে আসো তাহলে নামায ফাসিদ হবে না, তবে সাহূর সিজদা ওয়াজিব হবে। (উভয় ক্ষেত্রে কারণ অবশ্য ভিন্ন, সেটা তুমি ভেবে দেখো।)

আর যদি সোজা দাঁড়ানোর আগে মনে পড়ে যায় তাহলে তুমি বৈঠকে ফিরে আসবে। যদি দাঁড়ানোর কাছাকাছি চলে গিয়ে থাকো তাহলে সাহূর সিজদা ওয়াজিব হবে, আর যদি বসার কাছাকাছি থেকে থাকো তাহলে সিজদা ওয়াজিব হবে না। (কারণ ভেবে দেখো।)

০ যদি তুমি শেষ বৈঠকের পর অতিরিক্ত রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যাও, আর সিজদায় যাওয়ার আগে মনে পড়ে তাহলে বৈঠকে ফিরে আসা তোমার কর্তব্য। আর যদি সিজদায় চলে গিয়ে থাকো তাহলে তোমার ফরয বাতিল হবে না, কেননা শেষ বৈঠক হয়ে গেছে। এখন তুমি ইচ্ছা করলে আরেকটি রাক'আত যোগ করতে পারো, যাতে দুই রাক'আত নফল হয়ে যায়। যদি আরেক রাক'আত যোগ না করো তাহলে এই রাক'আতটি বেকার হলো। তবে উভয় ছূরতে তোমাকে সাহূর সিজদা করতে হবে।

কয়েকটি মাসআলা

১ – ইমামের ভুলে ইমাম ও মুক্‌তাদী উভয়ের উপর সাহূর সিজদা ওয়াজিব হয়, কিন্তু মুক্‌তাদীর ভুলে ইমাম ও মুক্‌তাদী কারো উপর সিজদা ওয়াজিব হয় না।[১]

২ – মাসবূক যদি ইমামের পরে কোন ভুল করে তাহলে তার উপর সাহূর সিজদা ওয়াজিব হবে।

৩ – সাহূর সিজদা ওয়াজিব হওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দিলে গোনাহ্ হবে এবং নামায দোহ্‌রানো ওয়াজিব হবে।

৪ – একাধিক ভুলের জন্য দু'টি সিজদাই যথেষ্ট।

৫ – সাহূর সিজদা না দিয়ে যদি নামায শেষে সালাম করে ফেলে,

---

১. سَهْوُ الإمامِ يُوجِب على المُؤتَمِّ السجودَ، و إن سَها المؤتَمُّ لا يسجُد الإمام و لا المؤتَمُّ .

তবে নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ না করা পর্যন্ত সাহূর সিজদা দেবে। আর নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ করে ফেললে সাহূর সিজদা রহিত হয়ে যাবে।

৬ – চার রাকাতী নামাযে যদি দুই রাক'আতের পর শেষ রাক'আত ভেবে সালাম করে ফেলে এবং তারপর মনে পড়ে তাহলে পরবর্তী নামায চালিয়ে যাবে এবং সাহূর সিজদা দেবে।

৭ – জুমু'আ ও ঈদে বড় জামা'আত হলে সাহূর সিজদা রহিত হয়ে যায়। কেননা তাতে 'ইনতিশার' হওয়ার আশংকা থাকে।

৮ – ইমাম সাহূর সিজদা থেকে ফারিগ হওয়ার পর সালামের আগে যদি কেউ ইক্‌তিদা করে তবে ইক্‌তিদা ছহী হবে, কিন্তু মুক্‌তাদীর উপর সিজদা ওয়াজিব হবে না।

৯ – সাহূর সিজদার হালাতে ইমামের ইক্‌তিদা করলে মুক্‌তাদীকেও ইমামের অনুসরণে সিজদা করতে হবে। দ্বিতীয় সিজদায় শরীক হলে ইমামের সঙ্গে দ্বিতীয় সিজদা করতে হবে, প্রথম সিজদার কাযা করতে হবে না।

প্রশ্নমালা

১ – সাহূর সিজদা দ্বারা নামাযের ক্ষতিপূরণ হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে মূলনীতি কী ?

২ – ভুলে ফরযের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআত ছেড়ে দিলো, কিংবা ইচ্ছা করে ফাতিহা ছেড়ে দিলো, কিংবা ভুলে সূরা যুক্ত করা ছেড়ে দিলো এবং সাহূর সিজদা দিয়ে নামায শেষ করলো, এ ক্ষেত্রে তোমার মতামত কী ?

৩ – একজন মাগরিবের প্রথম দুই রাক'আতে, আরেকজন প্রথম বা দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআত ভুলে গেলো এবং তৃতীয় রাক'আতে মনে পড়লো, এখন তাদের করণীয় ব্যাখ্যা করো।

৪ – মুনফারিদ জাহরী নামাযে সিররী ক্বিরাআত পড়লে কী হুকুম ?

৫ – সাহূর সিজদার ছূরত বলো।

৬ – নামাযের রাক'আত-সংখ্যায় সন্দেহের মাসআলা বয়ান করো।

৭ – তুমি শেষ বৈঠক ভুলে অতিরিক্ত রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে; এখন তোমার কি করণীয়?

৮ – কোন ছুরতে মুক্তাদীর নিজের ভুলে মুক্তাদীর উপর সাহূর সিজদা ওয়াজিব হয়, বুঝিয়ে বলো।

তিলাওয়াতি সিজদা

কোরআনে চৌদ্দটি সিজদার আয়াত রয়েছে। সূরাগুলোর নাম এই–

١ - الأعـراف ٢ - الرعـد ٣ - النحـل ٤ - الإسـرآء ٥ - مـريم ٦- الأولى في الحج ٧ - الفـرقـان ٨ - النمـل ٩ - الم السـجـدة ١٠ - ص ١١ - حم السجدة ١٢ - النجم ١٣ - الانشقاق ١٤ - العلق

০ তুমি যদি সিজদার কোন আয়াত তিলাওয়াত করো, কিংবা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সিজদার কোন আয়াত শোনো তাহলে তোমার উপর তিলাওয়াতি সিজদা ওয়াজিব হবে।[১]

০ ইমাম যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাহলে তিনি সিজদা দেবেন এবং মুক্তাদীও তার সঙ্গে সিজদা দেবে, কিন্তু মুক্তাদী সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে ইমাম-মুক্তাদী কারো উপরই সিজদা ওয়াজব হবে না।

০ যদি তুমি সিজদার আয়াত তিলাওয়াতকারী ইমামের পিছনে ইক্‌তিদা করো তাহলে তোমার উপরও সিজদা ওয়াজিব হবে, যদিও তুমি সিজদার আয়াত না শুনে থাকো।

০ সিজদার পুরো আয়াত পড়া বা শোনা জরুরী নয়, বরং সিজদার কোন একটি হরফ তার আগের বা পরের একটি শব্দসহ পড়া বা শোনাই সিজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

০ ঘুমন্ত, বিকৃতমস্তিষ্ক ও না-বালেগ বালক– এদের তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব হয় না এবং এদের তিলাওয়াত শ্রবণেও সিজদা ওয়াজিব

---

১. السجودُ واجِبٌ على مَنْ تَلا آيةَ سَجْدَةٍ أو سمِعها، قَصَدَ سَماع القرآن أو لم يقصِدْ

হয় না। মানুষ ছাড়া অন্য কিছু থেকে শোনা তিলাওয়াতেও সিজদা ওয়াজিব হয় না। যেমন টিয়া ও ময়না।

০ তুমি যদি এক মজলিসে সিজদার বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করো, কিংবা বিভিন্ন মজলিসে একটি সিজদার আয়াত বারবার তিলাওয়াত করো তাহলে যতবার তিলাওয়াত করবে ততবার তোমার উপর সিজদা ওয়াজিব হবে। কিন্তু এক মজলিসে এক আয়াত বারবার তিলাওয়াত করলে শুধু একটি সিজদাই ওয়াজিব হবে।

০ শ্রোতার মজলিস বিভিন্ন হলে সিজদাও বারবার ওয়াজিব হবে, তিলাওয়াতকারীর মজলিস বিভিন্ন হোক, বা অভিন্ন।

০ মজলিস থেকে দুই কদমের বেশী সরে গেলে ভিন্ন মজলিস হয়ে যাবে, তবে ঘর ও মসজিদ ছোট হোক বা বড়, অভিন্ন মজলিস বলেই গণ্য হবে।

০ নামাযের ভিতরে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে সঙ্গে সঙ্গে সিজদা করা ওয়াজিব। যদি সঙ্গে সঙ্গে রুকূতে চলে যায় এবং তিলাওয়াতি সিজদার নিয়ত করে তাহলে তা যথেষ্ট হবে। কিন্তু বিলম্ব করলে রুকূ বা নামাযের সিজদা যথেষ্ট হবে না, বরং আলাদা তিলওয়াতি সিজদা করতে হবে। যদি নামাযের ভিতরে আদায় না করে তাহলে তা রহিত হয়ে যাবে এবং ওয়াজিব তরকের গোনাহের কারণে তাওবা করতে হবে।

০ যদি সিজদা করার আগে নামায ফাসিদ হয়ে যায় তাহলে নামাযের বাইরে সিজদা করতে হবে।

০ নামাযের ভিতরে তুমি যদি এমন ব্যক্তির তিলাওয়াত শোনো যে তোমার নামাযে শরীক নয় তাহলে নামায থেকে ফারিগ হওয়ার পর তোমাকে সিজদা করতে হবে।

এই সিজদা নামাযের ভিতরে আদায় করলে জায়েয হবে না, বরং পরে আবার করতে হবে, তবে নামায ফাসিদ হবে না।

০ ইমাম সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করছেন, তুমি তা শুনলে তারপর ইমাম তিলাওয়াতি সিজদা করার আগেই তুমি ইক্‌তিদা করলে তাহলে ইমামের সঙ্গেই তুমি সিজদা করবে।

যদি ইমাম সিজদা করার পর ঐ রাক'আতেই তুমি ইক্‌তিদা করো তাহলে তুমি সিজদা পেয়েছো বলে ধরা হবে, সুতরাং নামাযের ভিতরে বা বাইরে তোমাকে আর সিজদা করতে হবে না।

তিলাওয়াতি সিজদার ছূরত?

দাঁড়ানো অবস্থা থেকে তাকবীর বলে সিজদায় চলে যাও, ঠিক যেভাবে নামাযের সিজদা করো। তারপর তিন তাসবীহ্ পড়ো, তারপর তাকবীর বলে মাথা তোলো, তিলাওয়াতের সিজদা হয়ে গেলো।

সিজদার তাকবীরের সময় (তাকবীরে তাহ্‌রীমার মত) হাত তোলবে না এবং সিজদা থেকে উঠে তাশাহ্‌হুদও পড়বে না, সালামও দেবে না।

০ তিলাওয়াতি সিজদার রোকন শুধু একটি, মাটিতে কপাল রাখা; কিংবা এর পরিবর্তে রুকূ করা, কিংবা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ইশারা করা। দুই তাকবীর হলো সুন্নাত। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সিজদায় যাওয়া উত্তম। তবে বসেও সিজদা করা যায়।

০ নামায ছহী হওয়ার জন্য যা যা শর্ত তিলাওয়াতি সিজদা ছহী হওয়ার জন্যও তা শর্ত। যেমন, শরীর, কাপড় ও জায়গা পাক হওয়া, সতর ঢাকা এবং কিবলামুখী হওয়া।

যে সব কারণে নামায ভঙ্গ হয় সে সব কারণে তিলাওয়াতি সিজদাও ভঙ্গ হয়। যেমন, কথা বলা, উচ্চ শব্দে হাসা, ইচ্ছাকৃত হাদাছ করা। তবে নামাযের মধ্যে হাসলে নামায ভঙ্গ হয়, তাহারাতও ভঙ্গ হয়, কিন্তু তিলাওয়াতি সিজদায় হাসলে সিজদা ভঙ্গ হয়, তবে তাহারাত ভঙ্গ হয় না।

কয়েকটি মাসআলা

১ – সিজদা ওয়াজিব হওয়ার ভয়ে সিজদার আয়াত বাদ দিয়ে তিলাওয়াত করা মাকরূহ্। তবে শ্রোতা সিজদার জন্য প্রস্তুত না থাকলে সিজদার আয়াত আস্তে তিলাওয়াত করা উত্তম।

২ – নামাযের একই রাক'আতে একই সিজদার আয়াত বারবার পড়লে একটি সিজদা ওয়াজিব হবে। বিভিন্ন রাক'আতে পড়লে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ্) এর মতে একটি সিজদা ওয়াজিব

হবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) এর মতে প্রতিটি তিলাওয়াতের জন্য একটি করে সিজদা ওয়াজিব হবে।

৩ – মুক্‌তাদী সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে তার উপর, ইমামের উপর এবং অন্যান্য মুক্‌তাদীর উপর সিজদা ওয়াজিব হবে না। নামাযের ভিতরেও না, বাইরেও না। তবে নামাযের বাইরে থেকে কেউ শুনলে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হবে।

প্রশ্নমালা

১ – তিলাওয়াতি সিজদা কখন ওয়াজিব হয়? তিলাওয়াত বা শ্রবণ ছাড়া সিজদা ওয়াজিব হওয়ার ছূরত কী?

২ – ক্যাসেটে সিজদার আয়াতের তিলাওয়াত শোনার কী হুকুম?

৩ – টেলিফোনে তোমার তোমাকে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালো, এর কী হুকুম ?

৪ – মজলিস পরিবর্তন হয় কীভাবে? দোকানদার যদি দোকানে হেঁটে হেঁটে একটি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে তাহলে তার উপর কয়টি সিজদা ওয়াজিব হবে এবং কেন?

৫ – একই স্থানে বসা অবস্থায় মজলিস পরিবর্তন হওয়ার ছূরত কী?

৬ – রাশেদ ঘরে একই স্থানে বসে একটি আয়াত দশবার তিলাওয়াত করলো আর তুমি ঐ ঘরে পায়চারি করতে করতে তা শুনলে. আর খালেদ রাস্তায় পায়চারি করতে করতে তা শুনলো, এখন কার উপর কয়টি সিজদা ওয়াজিব হবে এবং কেন?

৭ – চলন্ত গাড়ীতে কেউ সজদার একটি আয়াত তিনবার, কিংবা তিনটি আয়াত তিনবার তিলাওয়াত করছে আর তুমি শুনছো, এখন কাকে কয়টি সিজদা দিতে হবে এবং কেন?

৮ – দোলনায় দোল খেতে খেতে এক আয়াত বার বার তিলাওয়াত করলে কয়টি সিজদা ওয়াজিব হবে?

৯ – আমি সিজদার আয়াত পড়লাম, তুমি শুনলে, রাশেদও শুনলো। আমার উপর এবং রাশেদের উপর সিজদা ওয়াজিব হলো না, তোমার উপর হলো, তাহলে আমরা কে কী অবস্থায় ছিলাম?

ছালাতুল খাওফ

জিহাদের ময়দানে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায়ও নামাযের বিধান রয়েছে। সুতরাং বোঝা যায় যে, নামায কত গুরুত্বপূর্ণ রোকন। তবে শরীয়ত রণাঙ্গনে নামায আদায়ের বিধান খুব সহজ করে দিয়েছে, যাতে নামাযও আদায় হয়, আবার শত্রুরাও হামলা করার এবং ক্ষতিসাধনের সুযোগ না পায়।

০ রণাঙ্গনে উত্তম হলো আলাদা আলাদা ইমামের পিছনে আলাদা জামা'আতে নামায পড়ে নেয়া। কিন্তু যদি সকল মুজাহিদ একই ইমামের পিছনে নামায পড়তে চায় তাহলে তার ছূরত এই যে, ইমাম মুছল্লীদেরকে দু'ভাগ করবেন। একভাগ শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকবে। দ্বিতীয় ভাগকে নিয়ে ইমাম নামায শুরু করবেন এবং মুসাফির হলে, বা ফজর হলে এক রাক'আত আদায় করবেন, আর মুকিম হলে চার রাকাতী নামাযে দু'রাক'আত পড়বেন।

তারপর এই দল শত্রুর সামনে চলে যাবে এবং প্রথম দল ইমামের পিছনে এসে তাহরীমা বেঁধে নামায শুরু করবে। ইমাম তাদেরকে নিয়ে অবশিষ্ট নামায পড়বেন এবং সালাম ফেরাবেন, কিন্তু মুক্‌তাদীরা সালাম ফেরাবে না।

তারপর এরা শত্রুর সামনে চলে যাবে এবং আগে নামায পড়ে যাওয়া দলটি এসে ক্বিরাআত ছাড়া বাকী নামায পড়বে। তারপর তারা শত্রুর সামনে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দলটি এসে ক্বিরাআতসহ বাকী নামায পড়বে। কেননা তারা হলো মাসবূক।

০ মাগরিবের নামাযে ইমাম প্রথম দলের সঙ্গে দু'রাক'আত এবং দ্বিতীয় দলের সঙ্গে এক রাক'আত পড়বেন।

০ নামাযের মাঝে দু'দলের আসা-যাওয়া পায়দল হতে হবে, সওয়ার অবস্থায় হলে নামায হবে না; এ আসা যাওয়া কিবলা থেকে শত্রুর দিকে হোক, কিংবা শত্রু থেকে কিবলার দিকে।

০ পরিস্থিতি যদি এত গুরুতর হয় যে, সওয়ারি থেকে নামাই সম্ভব নয় তাহলে সে অবস্থায় জামা'আত জায়েয নয়, বরং সওয়ার অবস্থায় ইশারার মাধ্যমে একা একা নামায পড়ে নেবে। সম্ভব হলে কিবলামুখী হবে, আর

সম্ভব না হলে কিবলামুখ ছাড়াই পড়বে। তবু ওয়াক্ত মত নামায আদায় করতে হবে, কোন অবস্থায় নামায তরক করা যাবে না।

০ পায়দল মুজাহিদও নামায কাযা করতে পারবে না, বরং দাঁড়িয়ে, বসে রুকূ-সিজদা করে, কিংবা ইশারার মাধ্যমে যেভাবে সম্ভব নামায আদায় করে নেবে।

০ পরিস্থিতি যদি আরো গুরুতর হয় এবং নামায আদায় করা কোনভাবেই সম্ভব না হয় তাহলে পরে কাযা পড়ে নেবে। যেমন গাযওয়াতুল খান্দাকের সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছিলো।

কয়েকটি মাসআলা

১ – শত্রুর ভয় এবং হিংস্রপ্রাণীর ভয় উভয় ক্ষেত্রে একই হুকুম।

২ – ছালাতুল খাওফ তখনই জায়েয হবে যখন শত্রু সত্য সত্যই খুব কাছে থাকে এবং হামলার প্রবল আশংকা থাকে। পক্ষান্তরে শত্রু যদি দূরে থাকে কিংবা শত্রু আছে বলে ধারণা ছিলো, আসলে শত্রু ছিলো না, এ অবস্থায় ছালাতুল খাওফ পড়লে তা জায়েয হবে না।

৩ – নামাযের অবস্থায় শুধু শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকার অনুমতি রয়েছে। অস্ত্রচালনা বা অন্য কোন কাজ করার অনুমতি নেই; তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

কুসূফের নামায

০ কুসূফ মানে সূর্যগ্রহণ, আর খুসূফ মানে চন্দ্রগ্রহণ। সূর্যগ্রহণের সময় জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত নামায পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদাহ।

বুখারী শরীফে হযরত আবু মাসঊদ আনছারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুত্র হযরত ইবরাহীমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হলো। তখন লোকেরা বলাবলি করলো যে, (নবী-পুত্র) ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ ঘটেছে। তখন রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মিম্বারে দাঁড়িয়ে) খোতবা দিলেন

এবং বললেন– 'সূর্য ও চন্দ্র হচ্ছে আল্লাহর দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এগুলোর গ্রহণ হয় না। তোমরা যখন তা দেখতে পাও তখন সূর্য গ্রাসমুক্ত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর প্রশংসা করো এবং তাকবীর ও তাসবীহ পড়ো।'

তারপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে দু'রাক'আত নামায পড়লেন।

অন্যান্য বর্ণনায় জামা'আতের কথা রয়েছে, তাই ছালাতুল কুসূফ জামা'আতের সাথে পড়া সুন্নাত।

০ ছালাতুল খুসূফে জামা'আত নেই, বরং মানুষ নিজ নিজ ঘরে একা একা দু'রাক'আত নামায পড়বে।

০ ছালাতুল কুসূফের জামা'আতে আযান, ইকামাত ও খোতবা নেই।

০ নামায থেকে ফারিগ হয়ে সূর্য গ্রাসমুক্ত হওয়া পর্যন্ত ইমাম দু'আ করবেন, আর মুক্‌তাদীগণ আমীন বলতে থাকবে।

কয়েকটি মাসআলা

১ – সূর্যগ্রহণের পুরো সময়টুকু ছালাত ও দু'আয় মশগুল থাকা সুন্নাত। সুতরাং ইমাম নামাযের ক্বিরাআত ও রুকূ-সিজদা দীর্ঘ করবেন, কিংবা নামাযের পর দু'আ দীর্ঘ করবেন।

২ – গ্রহণের মত অন্যান্য ভয়ের সময়ও জামা'আত ছাড়া একা একা নামায পড়া মুস্তাহাব। যেমন ঝড়-তুফান, জলোচ্ছ্বাস, ভীষণ অন্ধকার এবং শত্রুর হামলা ইত্যাদি। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إذا رَأيتُمْ شَيْئًا من هٰذه الأَفْزاعِ فافزَعُوا إلى الصلاةِ

যখন তোমরা এ জাতীয় ভয়ের কিছু দেখো তখন নামাযের আশ্রয় গ্রহণ করো।

ইস্‌তিস্‌কার নামায

০ ইস্‌তিস্‌কা মানে প্রচণ্ড খরা ও অনাবৃষ্টির সময় আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা, যেন আল্লাহ রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং অনাবৃষ্টির মুছীবত থেকে উদ্ধার করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, অনাবৃষ্টির মুছীবতের সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযের মত দু'রাক'আত নামায পড়েছেন। সুতরাং সুন্নাত এই যে, ইমাম জাহরী ক্বিরাআতের সাথে দু'রাক'আত নামায পড়বেন এবং নামাযের পর দু'টি খোতবা দেবেন।

০ খোতবার পর ইমাম কিবলামুখী হয়ে রুমাল 'ওলট' করবেন। তারপর দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে দু'আ করবেন, আর মুক্‌তাদীগণ বসে কিবলামুখী হয়ে আমীন আমীন বলবে, তবে তারা রুমাল 'ওলট' করবে না।[১] ইমাম এভাবে দু'আ করবেন–

اللهم اسْقِنا غَيْثًا مُغِيثًا نافِعًا غيرَ ضارٍّ، عاجِلًا غيرَ آجِلٍ، اللهم اسْقِ عبادَكَ و بَهائِمَك و انشُرْ رحمَتَك و أَحْيِ بَلَدَك الميتَ، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنيُّ و نحنُ الفقَرآء، أنزِلْ علينا الغيثَ و اجعل ما أنزلتَ لنا قُوَّةً و بَلاغًا إلى حِيْنٍ

'হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টিতে সিঞ্চিত করুন যা উদ্ধারকারী এবং উপকারী, ক্ষতিকর নয় এবং যা অবিলম্বিত, বিলম্বিত নয়।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদের এবং আপনার জন্তুদের পানি দান করুন এবং আপনার রহমত প্রসারিত করুন এবং আপনার মৃত জনপদকে জীবন্ত করুন।

হে আল্লাহ! আপনিই তো আল্লাহ! আপনি ছাড়া নেই তো কোন ইলাহ। আপনি ধনী, আমরা ফকীর। সুতরাং আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন এবং যে বৃষ্টি নাযিল করবেন সেটাকে আমাদের জন্য নির্ধারিত সময় পর্যন্ত শক্তি ও প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম করুন।'

০ আবাদী এলাকার বাইরে খোলা ময়দানে পরপর তিনদিন ইস্‌তিস্‌কার নামাযের জন্য বের হওয়া মুস্তাহাব এবং প্রতিদিন নামাযের জন্য বের হওয়ার আগে দান-ছাদাকা করা এবং রোযা রাখা এবং গোনাহ থেকে বেশী বেশী ইস্‌তিগফার করা মুস্তাহাব।

---

১. و يَقْلِبُ الإمام رِداءَه و لا يقلِب القومُ أرْدِيتَهم

০ বৃদ্ধ ও শিশুদেরকে, এমনকি বোবা জানোয়ারগুলোকেও নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব, যাতে আল্লাহর রহমতে জোশ আসে।

০ ধোয়া, পুরোনো ও তালিযুক্ত কাপড় পরে বিনয়ের সাথে আল্লাহকে ভয় করে মাথা নত করে নামাযের জন্য বের হওয়া মুস্তাহাব।

কয়েকটি মাসআলা

১ – রুমাল 'ওলট' করার উদ্দেশ্য এ কথা প্রকাশ করা যে, এতদিন আমরা গোনাহের যে অবস্থায় ছিলাম এবং যে কারণে এই মুছীবত নাযিল হয়েছে সে অবস্থা আমরা পরিবর্তন করলাম এবং গোনাহ্ থেকে আনুগত্যের দিকে ফিরে এলাম।

রুমাল 'ওলট' করার তরীকা এই যে, রুমালের প্রান্ত উপরের দিক নীচে এবং নীচের দিক উপরে নিয়ে আসবে।

২ – ইমাম বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত না হলে ইস্‌তিস্‌কার জামা'আত হবে না, বরং সবাই একা একা নামায পড়বে।

৩ – ইস্‌তিস্‌কা-এর নামাযে আযান ইকামাত নেই, তবে খোতবা আছে।[১]

প্রশ্নমালা

১ – ছালাতুল খাওফ পড়ার ছূরত বয়ান করো।

২ – কুসূফ ও খুসূফের নামাযের পার্থক্য বর্ণনা করো।

৩ – কুসূফসংক্রান্ত হাদীছটি বলো।

৪ – বিভিন্ন ভয়ের সময় নামায পড়ার হাদীছটি বলো।

৫ – إستسقآء এর অর্থ বলো।

৬ – ইস্‌তিস্‌কা-এর জন্য বের হওয়ার মুস্তাহাবগুলো বলো।

৭ – রুমাল 'ওলট' করার উদ্দেশ্য ও তরীকা আলোচনা করো।

---

১. قال أبو حنيفةَ رحمه الله : ليسَ في الاستسقاءِ صلاةٌ مسنونَة بالجماعَة، فإن صَلَّى الناس وُحْدانًا جازَ، و إنَّما الاستسقاءُ الدُّعاء وَ الاستِغْفار .

নামাযের আযান ও ইকামাত

أذان এর আভিধানিক অর্থ হলো ঘোষণা। শারী'আতের পরিভাষায় أذان অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট শব্দযোগে নির্দিষ্ট নিয়মে নামাযের ঘোষণা।

০ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য এবং জুমু'আর জন্য আযান হলো সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এছাড়া অন্য কোন নামাযে আযান নেই।

০ ইকামাতও জুমু'আ এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায-এর জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ।

০ মুকীম-মুসাফির, জামা'আতের নামায ও একা নামায এবং ওয়াক্তিয়া ও কাযা নামায সর্বক্ষেত্রেই আযান ও ইকামাত সুন্নাত। আযানের শব্দগুলো এই–

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر – اشهد أن لا اله إلا الله، اشهد أن لا اله إلا الله – أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله – حي على الصلاة، حي على الصلاة – حي على الفلاح، حي على الفلاح – الله أكبر، الله أكبر – لا اله إلا الله –

আর ফজরের আযানে حي على الفلاح এর পর দু'বার الصلاة خير من النوم যোগ করা হবে।

ইকামাতও আযানের অনুরূপ, তবে حي على الفلاح এর পর দু'বার قد قامت الصلاة যোগ করা হবে।

কাযা নামাযের জন্যও আযান ও ইকামাত দেয়া হবে। যদি কয়েক ওয়াক্ত 'কাযা' হয়ে থাকে (এবং এক সঙ্গে কাযা করা হয় তাহলে প্রথমটির আযান ইকামত দুটোই দেয়া হবে। পরবর্তীগুলোতে ইচ্ছা করলে আযান ইকামত দু'টোই দেবে, কিংবা শুধু ইকামাত দেবে।

আযান দেয়া হবে ধীরে ধীরে আর ইকামাত দেয়া হবে একটু দ্রুত।

আযানের মুস্তাহাবসমূহ

১ – এমন ব্যক্তির আযান দেয়া মুস্তাহাব যিনি আমলদার এবং

নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং আযান-ইকামতের সুন্নাত সম্পর্কে জ্ঞাত।

২ – অযু অবস্থায় আযান দেয়া।

৩ – কেবলামুখী হওয়া (এবং حي على الصلاة এর সময় চেহারা ডান দিকে ফেরানো এবং حي على الفلاح এর সময় চেহারা বাম দিকে ফেরানো।)

৪ – কানে আঙ্গুল দেয়া।

৫ – আযান ও ইকামাতের মাঝে এতটা সময় রাখা যাতে মুছল্লীরা এসে হাজির হতে পারে (সময় সংকীর্ণ হলে বিলম্ব করবে না।)

৬ – মাগরিবে আযান ও ইকামাতের মাঝে ছোট তিন আয়াত বা তিন পদক্ষেপ পরিমাণ বিলম্ব করা (এর বেশী বিলম্ব না করা)।

আযান শোনামাত্র সমস্ত ব্যস্ততা ফেলে আযানের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত এবং মুআয্‌যিনের পরপর আযানের শব্দগুলো দোহরানো উচিত। তবে حي على الصلاة এবং حي على الفلاح এরপর لا حول و لا قوة إلا بالله বলবে এবং الصلاة خير من النوم এর পর صدقت و بررت বলবে।

আযান শেষে মুআয্‌যিন ও শ্রোতা সকলেরই এই দুআ পড়া মুস্তাহাব।

اللهم ربَّ هذه الدعوَةِ التامَّة و الصلاةِ القائمَةِ آتِ محمدًا الوسيلَةَ و الفَضِيلةَ وَ ابْعَثْه مَقامًا محمودًا الذي وعدْتَه ·

আযানের মাকরূহসমূহ

১ – সুর করে আযান দেয়া।

২ – বিনা অযুতে আযান দেয়া।

৩ – ফাসিক ব্যক্তির, বালকের এবং স্ত্রীলোকের আযান দেয়া।

৪ – বসে আযান দেয়া।

৫ – আযান ও ইকামাত-এর মাঝে কথা বলা বা পানাহার করা মাকরূহ। এরূপ করলে আযান দোহরাবে, তবে ইকামাত দোহরাবে না।

জানাযা ও তার নামায

মৃত্যুশয্যায় করণীয়

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (প্রতিটি প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।) সুতরাং মুসলমানের কর্তব্য হলো জীবনের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকা অবস্থায়ও মৃত্যুকে সবসময় স্মরণ রাখা এবং নেক আমলের মাধ্যমে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা; কারণ যে কোন সময় মৃত্যুর ডাক আসতে পারে।

তোমার সামনে যখন কারো মৃত্যুর আলামত শুরু হয়ে যায় তখন সুন্নাত এই যে, তুমি তাকে কিবলামুখী করে ডান কাতে শোয়াবে। চিত করেও শোয়াতে পারো যদি তাতে আরাম হয়। তখন পা দু'টো কিবলার দিকে থাকবে এবং মাথা একটু উঁচু করে দেবে, যাতে চেহারা কিবলামুখী হয়।

তারপর কালিমায়ে শাহাদাতের তালকীন করবে। অর্থাৎ তুমি নিজে তার সামনে একটু আওয়ায করে কালিমায়ে শাহাদাত পড়বে যাতে সে শুনতে পায়। তবে তাকে কালিমা পড়তে বলবে না। কেননা তখন তো খুব কষ্টের সময়! বলা যায় না, তার মুখে অন্য কথা এসে যেতে পারে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَقِّنُوا مَوْتَاكم لا إله إلا الله

তোমরা তোমাদের মরণাপন্নকে কালিমার তালকীন করো।

মৃত্যু-শয্যায় শায়িত ব্যক্তির কাছে বসে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ما مِنْ مَرِيضٍ يُقْرَأُ عِنده يٰسين إلاَّ ماتَ رَيَّانَ و أُدخِلَ في قَبْرِه رَيَّانَ و حُشِرَ يومَ القيامَةِ ريانَ . (رواه أبو داؤد)

কোন মৃত্যু-রোগীর কাছে সূরা ইয়াসীন পড়া হলে অবশ্যই সে তৃপ্ত

অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং তৃপ্ত অবস্থায় তাকে কবরে দাখেল করা হয় এবং কিয়ামতের দিন তাকে তৃপ্ত অবস্থায় ওঠানো হয়।

গোসলের আগে

তোমার প্রিয় মানুষটি যখন মারা গেলো তখন তুমি তার চোখ দু'টি বন্ধ করে দাও এবং একটি কাপড় দিয়ে মাথার উপর থেকে চোয়াল দু'টি বেঁধে দাও, যাতে মুখ খোলা না থাকে। চোখ দু'টি বন্ধ করার সময় তুমি এই দু'আ পড়বে–

بِسم الله وَ على مِلَّةِ رسول الله (صلى الله عليه و سلم) اللهم يَسِّرْ عليه أمرَه و سَهِّل عليه ما بَعْدَه، و أسعِدْه بِلِقَائه، وَ اجعَلْ ما خَرَج إليه خيرًا مِمَّا خَرَج منه

আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রাসূলের মিল্লাতের উপর (তার চোখ দু'টো বন্ধ করছি।) হে আল্লাহ! তার যাত্রা তার জন্য সহজ করে দিন এবং তার পরবর্তী অবস্থা তার জন্য আসান করে দিন এবং আপনার মিলন দ্বারা তাকে সৌভাগ্যবান করুন এবং তার গন্তব্যের স্থানকে তার রওয়ানার স্থানের চেয়ে উত্তম করুন।

তারপর দু'হাত বুকের উপর না রেখে দু'পাশে সোজা করে রেখে দাও।

০ গোসলের আগে মাইয়েতের নিকটে শব্দ করে কোরআন পড়া মাকরূহ। দূরে বসে তিলাওয়াত করা অবশ্য মাকরূহ নয়।

০ মৃত্যুর ঘোষণা দেয়া উত্তম, যাতে মানুষ মৃত্যু থেকে শিক্ষা নিতে পারে এবং জানাযায় শরীক হতে পারে। তবে গোসল ও কাফন-দাফনে বিলম্ব না করা মুস্তাহাব।

গোসলের আহকাম

০ মাইয়েতের গোসল জীবিতদের উপর ফরযে কিফায়া।[১] গোসলের শর্ত হলো ঃ ১. মাইয়েত মুসলমান হওয়া, সুতরাং কাফিরকে গোসল দেয়া হবে না। ২. মাইয়েতের শরীরের অধিকাংশ বিদ্যমান থাকা, কিংবা

---

১. غَسْلُ الميتِ فَرْضُ كِفايَةٍ على الأَحْياءِ، إذا قامَ بعضُ الناسِ بِغَسْلِ الميتِ سقَطَ الفرضُ عن البَاقِينَ، و إن لَمْ يَقُمْ أحَدٌ بِغَسْلِه أَثِمَ الجميعُ .

মাথাসহ অর্ধেক শরীর বিদ্যমান থাকা। ৩. শহীদ না হওয়া। শহীদের সম্মান এই যে, তাকে গোসল ছাড়া তার রক্তমাখা কাপড়েই দাফন করা হবে।

০ শিশু যদি পূর্ণ দেহ নিয়ে দুনিয়াতে আসে –মৃত অবস্থায় হলেও– তাকে গোসল দেয়া হবে।

গোসলের তরীকা

গোসল দেয়ার খাটটিকে প্রথমে তিনবার ধূপ দাও এবং মাইয়েতকে ঐ খাটে শোয়াও। তারপর একটি কাপড় দ্বারা তার সতর ঢাকার ব্যবস্থা করো এবং যে কাপড়ে মারা গেছে তা সরিয়ে ফেলো।

তারপর নামাযের মত করে তাকে অযু করাও। তবে কুলি ও নাকে পানি দেয়ার পরিবর্তে ভেজা কাপড় দিয়ে মুখ ও নাক মুছে দাও।[১]

তারপর বড়ই পাতার ফুটানো পানি শরীরে ঢেলে দাও এবং (ময়লা বিদূরক) 'খিতমী' বা (হালাল) সাবান দিয়ে মাথা ও দাড়ি ধুয়ে দাও। বড়ই পাতা না পেলে শুধু পানিই যথেষ্ট।

তারপর বাম কাতে শুইয়ে ডান পার্শ্ব থেকে পানি ঢালো। পানি যেন নীচ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর ডান কাতে শুইয়ে বাম পার্শ্ব থেকে পানি ঢালো। পানি যেন নীচ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

তারপর মাইয়েতকে বসার মত করে তোমার সাথে হেলান দিয়ে রাখো এবং মাইয়েতের পেটে কোমল ভাবে চাপ দিয়ে মুছে দাও। যদি কোন নাজাসাত বের হয় তবে তা একটি কাপড় দিয়ে মুছে দাও এবং শুধু ঐ জায়গাটুকু ধুয়ে দাও, পুরো গোসল দোহরানোর দরকার নেই। এরপর শুকনো কাপড় দিয়ে শরীর মুছে দাও, যেন কাফন ভিজে না যায়।

এবার মাইয়েতের মাথায় ও দাড়িতে হানুত (সুগন্ধি) মেখে দাও এবং সিজদার অঙ্গগুলোতে কর্পুর মেখে দাও।

মাইয়েতের নখ ও চুল কাটবে না এবং চুল ও দাড়ি আঁচড়াবে না।

---

১. يُوضَعُ الميتُ على سريرٍ مُجَمَّرٍ وِتْراً، و تُسْتَرُ عورَتُه من السُّرَّةِ إلى الرُّكْبَةِ، ثم تُنْزَعُ عنه ثِيابُه، و يُوَضَّأُ كَوُضوءِ الصلاة و لكنه لا يُمَضْمَضُ و لا يُسْتَنشَقُ، بل يُمسَحُ فمُه و أنفُه بِخِرْقَةٍ مُبْتَلَّةٍ بالماءِ .

কাফনের বয়ান

০ মাইয়েতকে কাফন দেয়া ফরযে কিফায়া। সমস্ত শরীর ঢাকার পরিমাণ কাফন দ্বারা ফরযে কিফায়া আদায় হয়ে যায়।

০ মাইয়েতের নিজস্ব সমগ্র মাল থেকে কাফনের ব্যবস্থা করা হবে। কাফনের খরচ– ঋণ, অছিয়ত ও মীরাছের উপর অগবর্তী হবে। কেননা কাফন হলো মাইয়েতের প্রয়োজন।

মাইয়েতের মাল না থাকলে জীবিত অবস্থায় তার উপর যাদের ভরণ-পোষণ জরুরী ছিলো তারা কাফনের খরচ বহন করবে। তাদের কারো মাল না থাকলে বাইতুল মাল থেকে খরচ করা হবে। বাইতুল মাল থেকে সম্ভব না হলে সক্ষম মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হবে।

০ কাফনের তিনটি স্তর, যথা– সুন্নত কাফন, কিফায়া কাফন এবং জরূরতের কাফন।

০ পুরুষের সুন্নাত কাফন তিনটি– কামীছ, ইযার ও লিফাফা। পুরুষের জন্য কিফায়া কাফন হলো ইযার ও লিফাফা। এর কম হওয়া মাকরূহ।[১]

জরূরতের কাফন হলো ঐ পরিমাণ যা জরূরতের সময় পাওয়া যায়, হোক না তা সতর ঢাকার পরিমাণ।

০ কাফনের কাপড় সুতি ও সাদা হওয়া উত্তম।

০ ইযারের মাপ হলো মাথার উপর থেকে পায়ের শেষ পর্যন্ত, আর লিফাফা ইযার থেকে এক হাত লম্বা হবে, আর কামীছ হবে গলা থেকে পা পর্যন্ত। তবে কামীছের হাতা হবে না।

০ স্ত্রীলোকের সুন্নাত কাফন পাঁচটি– লিফাফা, ইযার, কামীছ, ওড়না ও খিরকা। স্ত্রীলোকের কিফায়া কাফন তিনটি– ইযার, লিফাফা ও ওড়না। আর জরূরতের কাফন হলো ঐ পরিমাণ যা জরূরতের সময় পাওয়া যায়।

০ খিরকা (কাপড়ের টুকরা) বুক থেকে উরু পর্যন্ত হওয়া উত্তম, তবে বুক থেকে নাভি পযর্ন্ত হলেও চলে।

---

১. وَ السنّةُ أن يُكفَنَ الرجُلُ في ثَلاثةِ أثوابٍ، إزارٍ و قَميصٍ وَ لِفافَةٍ، وَ تُكفَنَ المرأةُ في خمسَةِ أثوابٍ، إزارٍ و قَميصٍ و خِمارٍ و خِرْقَةٍ و لِفافَةٍ.

কাফন পরানোর তরীকা

তুমি তোমার প্রিয়জনকে কাফন পরানোর আগে তাতে তিনবার ধূপ দাও। তারপর প্রথমে লিফাফা বা চাদর বিছাও, তার উপরে ইযার রাখো, তার উপরে কামীছ রাখো, তারপর মাইয়েতকে রাখো।

প্রথমে কামীছ পরাও। তারপর প্রথমে বাম দিক থেকে এবং পরে ডান দিক থেকে ইযার ভাঁজ করো। তারপর লিফাফা প্রথমে বাম থেকে, তারপর ডান থেকে ভাঁজ করো। এবং মাথা ও পায়ের দিক থেকে কাফন বেঁধে দাও, যাতে কাফন খুলে না যায়।[১]

স্ত্রীলোককে কাফন পরানোর তরীকা এই যে, প্রথমে লিফাফা বিছানো হবে, তার উপরে ইযার বিছানো হবে, তার উপরে কামীছ বিছানো হবে।

প্রথমে কামীছ পরানো হবে এবং চুল দু'টি বেণী করে দু'দিক থেকে বুকের উপর কামীছের উপরে রাখা হবে। তারপর তার মাথায় ওড়না দেয়া হবে, তবে পেঁচানো হবে না, বাঁধাও হবে না। তারপর ইযারকে প্রথমে বাম দিক থেকে এবং পরে ডান দিক থেকে পেঁচানো হবে। তারপর খিরকা দ্বারা বুক বাঁধা হবে। তারপর লিফাফা প্রথমে বাম থেকে, পরে ডান থেকে পেঁচানো হবে।

কয়েকটি মাসআলা

১ – কাফনের কাপড় পাক হওয়া শর্ত এবং সাদা হওয়া উত্তম। পুরুষের রেশমী কাপড়ের কাফন জায়েয নেই। কেননা জীবিত অবস্থায় রেশমী কাপড় ব্যবহার করা তার জন্য জায়েয ছিলো না। স্ত্রীলোকের কাফন রেশমী কাপড়ের হতে পারে।

২ – জীবিতদের মত মাইয়েতের গোসলেও তিনবার পানি ঢালা

---

১. كَيْفِيَّةُ تكفينِ الرجُلِ : تُوضَعُ اللِّفافَةُ أَوَّلاً، ثم الإزارُ، ثم القميصُ، ثم الميتُ، و يُلبَس القَميص، ثم يُلَفُّ الإزارُ مِنَ اليَسار أَوَّلاً و منَ اليَمينِ ثانيًا، ثم تُلَفُّ اللِّفافَةُ من اليَسار أولا و من اليَمينِ ثانيًا، و يُعْقَدُ الكَفَنُ على طَرَفَيْهِ كي لا يَنْتَشِرَ .

সুন্নাত। পানিতে পাওয়া মৃতদেহকেও গোসল দেওয়া ওয়াজিব। অর্থাৎ গোসলের নিয়তে পানিতে তিনবার মৃতদেহকে নাড়া হবে।

৩ – পুরুষ পুরুষকে এবং স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককে গোসল দেবে। এর বিপরীত করা জায়েয নয়। তবে স্ত্রী তার স্বামীকে গোসল দিতে পারে, কিন্তু স্বামী তার স্ত্রীকে গোসল দিতে পারে না।

৪ – স্ত্রীলোককে গোসল দেয়ার জন্য পুরুষ ছাড়া কাউকে পাওয়া না গেলে পুরুষ তাকে শুধু তায়াম্মুম করাবে; মাহরাম হলে খালি হাতে, আর না-মাহরাম হলে হাতে কাপড় পেঁচিয়ে।

প্রশ্নমালা

১ – মৃত্যুর আলামত শুরু হওয়ার পর কী করণীয়?

২ – মৃত্যুশায়ীর কাছে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াতের ফযীলত বলো।

৩ – মাইয়েতকে গোসল দেওয়ার তরীকা বলো।

৪ – কে কাকে গোসল দিতে পারে বা পারে না, বলো।

৬ – নারী ও পুরুষের কাফনের তিনটি স্তরের বিবরণ দাও।

৭ – পুরুষের কাফন পরানোর তরতীব বলো।

৮ – মাইয়েতকে গোসল দেওয়ার শর্ত আলোচনা করো।

জানাযার নামায

০ মাইয়েতের জানাযা পড়া মুসলমানদের উপর ফরযে কিফায়া। কোন একজন মুসলমান যদি জানাযা পড়ে নেয় তবে অন্যদের থেকে ফরয রহিত হয়ে যাবে, কিন্তু একজনও যদি না পড়ে তাহলে সবাই গোনাহগার হবে। তবে যারা মৃত্যুর খবর পায় নি তাদের গোনাহ হবে না।[১]

০ যাদের উপর নামায ফরয তাদেরই উপর জানাযার নামায পড়া ফরয, যদি মৃত্যুর খবর পেয়ে থাকে।

---

১. الصلاة على الميتِ فرضُ كفايَةٍ على المسلمين، إذا صَلَّى واحدٌ سقَطَ الفرضُ عن الباقِينَ و إن لم يُصَلِّ عليه أَحَدٌ أَثِمَ الجميعُ و الذي لا يَعلم بِمَوته لا تَجِبُ عليه صلاةُ الجَنازَةِ ·

০ জানাযার নামাযের রোকন দু'টি – চার তাকবীর ও কিয়াম। প্রতিটি তাকবীর একটি রাক'আতের স্থলবর্তী। সুতরাং কোন তাকবীর বাদ দিলে জানাযা হবে না এবং বিনা ওযরে কিয়াম তরক করা জায়েয হবে না।

০ জানাযার নামায পড়ার জন্য শর্ত হলো –

১. মাইয়েত মুসলমান হওয়া। সুতরাং কাফিরের জানাযা জায়েয নয়।

২. হুকমী ও হাকীকী নাজাসাত থেকে মাইয়েতের পাক হওয়া। সুতরাং গোসলের আগে জানাযা পড়া জায়েয নয়।

৩. মাইয়েত বা তার অধিকাংশ দেহ ইমামের সামনে হাযির থাকা। সুতরাং গায়েবানা জানাযা জায়েয নেই।

৪. মাইয়েতকে মুছুল্লীদের সামনে মাটিতে রাখা। সুতরাং মাইয়েতকে মুছুল্লীদের পিছনে রেখে এবং গাড়ীতে বা মানুষের কাঁধে রেখে জানাযা পড়া ছহী নয়। তবে ওযরের কারণে মাটিতে না রেখে জানাযা পড়া জায়েয হবে।

জানাযা যদি খাটিয়ায় থাকে, আর খাটিয়া মাটিতে রাখা হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

০ শিশু যদি জীবিত অবস্থায় দুনিয়াতে এসে তারপর মারা যায় তাহলে তার জানাযা পড়া হবে। যদি মৃত অবস্থায় দুনিয়াতে আসে তাহলে তার জানাযা নেই, বরং তাকে গোসল দিয়ে কাপড়ে পেঁচিয়ে দাফন করা হবে। কান্না বা নড়া-চড়া হলো প্রাণ থাকার আলামত।[১]

জানাযার নামাযের সুন্নাত

জানাযার নামাযের সুন্নাত এই যে– ১. মাইয়েত পুরুষ হোক বা নারী, ইমাম মাইয়েতের বুক বরাবর দাঁড়াবেন। ২. প্রথম তাকবীরের পর (ইমাম ও মুক্‌তাদী) ثناء পড়বে। ৩. দ্বিতীয় তাকবীরের পর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়বে। ৪. তৃতীয় তাকবীরের পর মাইয়েতের জন্য দু'আ করবে।

---

১. يُصَلَّى على المولودِ الذي وُجِدَتْ به حَيَاةٌ حالَ الوِلادَةِ، و إن لم تُوجَدْ به حَيَاةٌ لا يُصَلَّى عليه، بل يُغسَلُ و يُلَفُّ في ثَوبٍ و يُدْفَنُ، وَ البُكاء أو الحَرَكَة دليلُ الحَياةِ .

মাইয়েত বালিগ হলে পুরুষ হোক বা স্ত্রী এই দু'আ পড়বে

اللهم اغْفِرْ لِحَيِّنَا و مَيِّتِنا و شاهِدنا و غَائِبِنا و صَغيرنا و كبيرنا و ذَكَرنا و أُنثانا.

اللهم مَنْ أَحْيَيْتَه مِنا فَأَحْيِه على الإسلام و من تَوَفَّيْتَه منا فَتَوَفَّه على الإيمان

মাইয়েত না-বালিগ ছেলে হলে এই দু'আ পড়বে–

اللهم اجْعَلْه لنا فَرْطًا و اجعَلْه لنا أَجْراً و ذُخْراً و اجعَلْه لنا شافِعًا و مشفَّعا

মাইয়েত না-বালিগা মেয়ে হলে এই দু'আ পড়বে–

اللهم اجعلها لنا فرطا و اجعلها لنا أجرا و ذخرا و اجعلها لنا شافعة و مشفعة

চতুর্থ তাকবীরের পর দুই দিকে সালাম বলে নামায শেষ করবে।

০ শুধু প্রথম তাকবীরে হাত তোলবে, অন্যান্য তাকবীরে তোলবে না।

০ জানাযার নামাযের কাতার তিন, পাঁচ, সাত ইত্যাদি বেজোড় সংখ্যা হওয়া মুস্তাহাব।

কয়েকটি মাসআলা

১ – মাইয়েতকে যদি বিনা গোসলে দাফন করা হয় এবং মাটি দিয়ে দেয়া হয় তাহলে বিনা গোসলেই তার কবরের সামনে জানাযা পড়া হবে। আর মাটি দেয়া না হলে কবর থেকে তুলে গোসল দেয়া হবে, তারপর জানাযা পড়ে দাফন করা হবে।

২ – মাইয়েতের অলী যদি জানাযা পড়ে ফেলে তাহলে আর জানাযা দোহরানোর সুযোগ নেই।

৩ – মাইয়েতকে জানাযা ছাড়া দাফন করা হলে তার কবরের সামনে জানাযা পড়া হবে, যতক্ষণ ধারণা হয় যে, মৃতদেহ নষ্ট হয় নি। নষ্ট হয়ে গেছে বলে ধারণা হলে আর জানাযা পড়া যাবে না।

৪ – একাধিক জানাযা একসঙ্গে হাজির হলে উত্তম হলো প্রত্যেকের নামায আলাদা আলাদা পড়া, তবে একসঙ্গেও পড়া যায়।
সব জানাযা একসঙ্গে পড়লে জানাযাগুলো ইমামের সামনে লম্বা কাতার করে রাখা হবে। প্রথমে পুরুষদের, তারপর বালকদের, তারপর স্ত্রীলোকদের জানাযা রাখা হবে।

৫ – বিনা ওযরে মসজিদে মাইয়েতের জানাযা পড়া মাকরূহ। ওযরের কারণে হলে মাকরূহ হবে না। তবে মাইয়েতকে মসজিদের বাইরে রাখা হবে।

প্রশ্নমালা

১ – জানাযার নামাযের রোকন কী কী?

২ – জানাযার নামাযের শর্ত কী কী?

৩ – নবজাতকের জানাযা পড়ার মাসআলা কী?

৪ – মসজিদে জানাযা পড়ার হুকুম কী?

৫ – একাধিক জানাযা হাজির হলে কী করণীয়?

জানাযা বহন ও দাফন

০ জানাযা বহন করা এবং জানাযার পিছনে পিছনে যাওয়া এবং দাফনে শরীক হওয়া সুন্নাত। তবে জানাযার সাথে স্ত্রীলোকদের যাওয়া মাকরূহে তাহরীমী।

০ জানাযা চারজন পুরুষের বহন করে নেয়া সুন্নাত এবং প্রত্যেক বহনকারীর চল্লিশ কদম বহন করা সুন্নাত।

তুমি যদি জানাযা বহন করতে চাও তাহলে প্রথমে সামনে মাইয়েতের ডান দিক তোমার ডান কাঁধে নেবে, তারপর পিছনে ডান দিক তোমার ডান কাঁধে নেবে, তারপর সামনে বাম দিক তোমার বাম কাঁধে নেবে, তারপর পিছনে বাম দিক তোমার বাম কাঁধে নেবে ।

০ জানাযা বহন করে দ্রুত চলা মুস্তাহাব, তবে এত দ্রুত নয় যাতে মাইয়েতের নড়া-চড়া হয় এবং জানাযার অনুগামীদের কষ্ট হয়।

০ জানাযার অনুগামীদের কর্তব্য হলো জানাযার পিছনে চলা। জানাযার সামনে চলা মাকরূহ।

০ কবরের স্থানে পৌঁছার পর মাইয়েতকে কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখার আগে বসা মাকরূহ। কেননা এটা জানাযার প্রতি অসম্মান।

দাফনের আহকাম

০ কবরকে সোজা না করে লাহ্‌দ করা সুন্নাত। কেননা হযরত ইবনে

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَللَّحْدُ لنا و الشَّقُّ لِغَيْرِنا

লাহদ অর্থ সোজা কবর খুঁড়ে কিবলার দেয়াল ভিতরের দিকে কিছু পরিমাণ খোঁড়া যাতে সেখানে মাইয়েতকে রাখা যায়। তবে মাটি নরম হলে লাহদ-এর পরিবর্তে সোজা করবে।

০ কবরের গভীরতা মানুষের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক হওয়া সুন্নাত, তবে তার চেয়ে কিছুটা বেশী হতে পারে।

০ মাইয়েতকে কিবলার দিক থেকে দাখেল করবে এবং ডান কাতে কিবলামুখী করে শোয়াবে। যে ব্যক্তি মাইয়েতকে কবরে রাখবে সে রাখার সময় بسم الله و على ملة رسول الله বলবে। মাইয়েতকে কবরে রাখার পর কাফনের বাঁধন খুলে দেবে।[১]

০ স্ত্রীলোককে কবরে নামানোর সময় কবরের উপরে পর্দা দিয়ে নেবে, পুরুষের ক্ষেত্রে পর্দার প্রয়োজন নেই।

০ মাইয়েতকে কবরে রাখার পর কাঁচা ইট অথবা বাঁশ দিয়ে ঢেকে দেবে। পাকা ইট এবং কাঠ দিয়ে ঢাকা মাকরূহ, তবে কাঁচা ইট বা বাঁশ পাওয়া না গেলে মাকরূহ হবে না।

০ দাফনের জন্য উপস্থিত প্রত্যেকে তিন মুঠ করে মাটি দেবে। প্রথম মুঠের সময় বলবে منها خلقناكم দ্বিতীয় মুঠের সময় বলবে و فيها نعيدكم এবং তৃতীয় মুঠের সময় বলবে و منها نخرجكم تارة أخرى

তারপর মাটি ফেলে কবর পূর্ণ করে দেবে। কবরকে উটের কুঁজের মত করা হবে, চার কোণা করা হবে না।

কয়েকটি মাসআলা

১ – সৌন্দর্যের জন্য বা গর্ব করার জন্য কবরকে পাকা করা হারাম, আর মজবুত করার জন্য কবরকে পাকা করা মাকরূহ।

---

১. وَيُدْخَلُ الميتُ مِنْ جِهَةِ القبلَةِ، و الذي يَضَعُ الميتَ في القبر يقول : بسم الله و على ملة رسول الله، و يُوَجَّهُ الميتُ نحوَ القبلَةِ على جَنْبِه الأيمَنِ .

২ – ঘরের ভিতরে দাফন করা মাকরূহ। কেননা এটা শুধু নবীদের সাথে খাছ।

৩ – প্রয়োজনের সময় একই কবরে কয়েকজনকে দাফন করা জায়েয আছে। তখন দু'জনের মাঝে মাটি দিয়ে আলগ করে দেয়া মুস্তাহাব।

৪ – পানির জাহাযে যদি মারা যায়, আর স্থল দূরে হয় এবং মৃতদেহ নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে গোসল, কাফন ও জানাযার পর মাইয়েতকে পানিতে নামিয়ে দেয়া হবে। সমুদ্রের পানিই হবে তার কবর।

৫ – পুরুষদের জন্য কবর যিয়ারাত করা মুস্তাহাব, স্ত্রীলোকদের জন্য মাকরূহ। কবর যিয়ারাতের সময় বলবে–

السلام عليكم يا أهلَ القبور، أنتم لنا سَلَفٌ و نحن لكم تَبَعٌ، و إنا إن شآء الله بِكم لاحقون، يرحَم الله المستَقْدِمِين منا و المستَأْخِرين، أسألُ اللّٰهَ لنا و لكم العافيةَ، يغفِر الله لنا و لكم و يرحَمنا الله و إيَّاكم

কবর যিয়ারাতের সময় সূরা ইয়াসীন পড়া মুস্তাহাব।

প্রশ্নমালা

১ – জানাযা কাঁধে নেয়ার সুন্নাত তরীকা বলো।

২ – জানাযার সঙ্গে যাওয়ার সুন্নাত তরীকা বলো।

৩ – কবর তৈরী করার সুন্নাত তরীকা কী এবং তার দলীল কী?

৪ – মাইয়েতকে কবরে নামানোর এবং কবরে রাখার সুন্নাত তরীকা বলো।

৫ – কবরে মাটি দেয়ার তরীকা বলো।

৬ – পানির জাহাযে মারা গেলে কী করণীয়?

শহীদের আহকাম

আল্লাহর রাস্তায় যারা শহীদ হয় তাদের অনেক মর্যাদা। শহীদানের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

و لا تَحْسَبَنَّ الذين قُتِلوا في سَبيل الله أمْواتًا، بَلْ أحياءٌ عندَ ربهم يُرزَقون،
فَرِحِين بِما آتاهم اللّٰه مِنْ فَضْلِه و يَسْتَبشِرون بالذين لم يَلْحَقوا بهم مِنْ
خَلْفِهم أن لا خَوْفٌ عليهم و لا هم يَحْزَنون

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে মৃত ভেবো না, বরং তারা আপন প্রতিপালকের নিকট জীবিত, তাদেরকে রিযিক দান করা হয়। আল্লাহ তাদেরকে আপন অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে তারা সন্তুষ্ট। আর যারা এখনো তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় নি তাদেরকে তারা এই সুসংবাদ দান করে যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ما مِنْ أحَدٍ يَدْخُلُ الجنةَ يُحِبُّ أن يَرجِعَ إلى الدنيا وَ له ما في الأرْضِ مِنْ
شَيْءٍ إلا الشهيدَ، يَتَمَنّى أن يرجِعَ إلى الدنيا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرّاتٍ لِما يَرى
مِنَ الكرامَةِ (رواه البخاري و مسلم)

জান্নাতে দাখেল হওয়া কোন মানুষ এটা পছন্দ করবে না যে, সে দুনিয়াতে ফিরে আসবে, আর তাকে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দান করা হবে। শুধু শহীদ আখেরাতে তার মর্যাদা দেখার কারণে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, সে যেন দুনিয়াতে ফিরে আসে, আর তাকে যেন দশবার শহীদ করা হয়।

০ আল্লাহর রাস্তায় কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যে মুসলমান নিহত হয় সে যেমন শহীদ তেমনি ঐ মুসলমানও শহীদ যাকে জুলুম করে হত্যা করা হয়েছে। কাফিররা হত্যা করুক, কিংবা ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীরা হত্যা করুক, কিংবা ডাকাতরা হত্যা করুক এবং যে অস্ত্র দিয়েই হত্যা করা হোক।[১]

০ শহীদ যদি প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্ক হয় এবং 'মুরতাছ' না হয় তাহলে তাকে গোসল দেয়া হবে না, বরং তার রক্তমাখা কাপড়ই হবে তার কাফন। শুধু তার জানাযা পড়ে সেভাবেই তাকে দাফন করা হবে।

---

১. الشهيدُ مَنْ قَتَله المشركون أو وُجِدَ في المَعْرَكَةِ جريحًا أو قَتَله المسلمون ظُلْمًا و
لم يَجِبْ بِقَتْلِه دِيَةٌ و لا يُغَسَّلُ الشهيدُ بل يُكَفَّنُ في ثِيابه و يُصلّى عليه ·

০ শহীদের সমস্ত কাপড় খুলে ফেলা মাকরূহ, তবে কাফনের সুন্নাত পুরা করার জন্য কমানো বা বাড়ানো যাবে।

০ শহীদ যদি না-বালিগ হয়, বা অসুস্থমস্তিষ্ক হয়, বা 'মুরতাছ' হয় তাহলে তাকে গোসল দেয়া হবে এবং স্বাভাবিক কাফনে দাফন করা হবে, তবে আখেরাতে সে শহীদের ফযীলত ও মর্যাদা অবশ্যই লাভ করবে।

মুরতাছ হওয়ার অর্থ আহত হওয়ার পর জীবনের কোন সুবিধা গ্রহণ করা, যেমন আরামের জন্য যুদ্ধের ময়দান থেকে সরিয়ে আনা, পানাহার করা, ঘুমানো, চিকিৎসা গ্রহণ করা, কিংবা হুঁশের অবস্থায় এক ওয়াক্ত নামাযের সময় পার হওয়া।

কয়েকটি মাসআলা

১ – যুদ্ধের মাঠে যাকে মৃত পাওয়া যায়, কিন্তু তার শরীরে হত্যার কোন আলামত পাওয়া না যায় তাকে গোসল দেয়া হবে।

২ – কাফনজাতীয় নয় এমন সমস্ত জিনিস শহীদের শরীর থেকে খুলে ফেলা হবে। যেমন অস্ত্রসস্ত্র, চামড়ার বা পশমের পোশাক।

৩ – নিজের এবং নিজের পরিবারের জান-মাল ও ইজ্জত আবরু রক্ষা করতে গিয়ে যে নিহত হবে সেও শহীদ হবে, যদি ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়।

৪ – পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে, মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে যে মারা যায় এবং ইলম শিক্ষা করার অবস্থায় যে মারা যায় সেও শহীদের ফযীলত লাভ করবে, তবে তাকে গোসল দেয়া হবে।

প্রশ্নমালা

১ – শহীদের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে যা জানো বলো।

২ – শহীদের পরিচয় বলো।

৩ – শহীদকে গোসল না দেয়ার শর্ত কী কী?

৪ – 'মুরতাছ' কাকে বলে ?

যাকাত অধ্যায়

الزكاة শব্দের আভিধানিক অর্থ النماء و الطهارة বা বৃদ্ধি ও পবিত্রতা। শারী'আতের পরিভাষায় الزكاة অর্থ – বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ মাল থেকে বিশেষ পরিমাণ আলগ করে শারী'আত-নির্ধারিত হকদারকে মালিক বানিয়ে দেয়া।

যাকাতকে যাকাত এজন্য বলে যে, তা যাকাত আদায়কারীকে গোনাহ থেকে পাক করে এবং তার নফসকে বুখল ও কৃপণতার মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র করে।

অন্যদিকে যাকাত মালিকের অবশিষ্ট মালে বরকত আনয়ন করে এবং গরীবের মাল বৃদ্ধি করে, ফলে সমাজের অর্থনৈতিক জীবন সচল থাকে।

যাকাত দ্বারা সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও দুর্দশা দূর হয় এবং ধনী ও গরীবের মাঝে ভালোবাসা ও মুহব্বতের বন্ধন সৃষ্টি হয়।

হিজরতের দ্বিতীয় বছর রামাযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে যাকাত ফরয হয়েছে, আর যাকাতের ফরযিয়ত কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সুপ্রমাণিত। সুতরাং যাকাতের ফরযিয়ত অস্বীকারকারী কাফির হবে, আর যারা যাকাতের ফরযিয়ত স্বীকার করেও তা আদায় করে না, তারা জঘন্য কবীরা গোনাহে লিপ্ত ফাসিক। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়াফাতের পর যারা যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করেছিলো, হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।

কোরআন হাদীছে যাকাত আদায় করার ফযীলত যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি যাকাত আদায় না করা সম্পর্কে কঠিন হুঁশিয়ারি এসেছে। কোরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন–

وَ الذين يَكْنِزونَ الذهَب و الفِضةَ و لا يُنفِقونها في سَبيل الله فَبَشِّرْهم بِعذاب أليم، يومَ يُحْمىٰ عليها في نار جَهنَّمَ فَتكْوىٰ بها جِباهُهم وَ جُنوبهم وَ ظُهورهم، هذا ما كَنزتُم لِأَنْفسِكم، فَذُوقوا ما كنتم تَكْنِزون

আর যারা সোনা-চাঁদি সঞ্চয় করে রাখে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও, যেদিন ঐ সোনা-চাঁদিকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপাল এবং পার্শ্ব এবং পিঠ দাগানো হবে, (আর বলা হবে) এ তো সেই সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করতে। সুতরাং যা তোমরা সঞ্চয় করতে তার স্বাদ ভোগ করো।

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

আল্লাহ্ যাকে মাল দান করেছেন, কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করে নি, কেয়ামতের দিন ঐ মাল বিষধর সাপ হয়ে তাকে পেঁচিয়ে ধরবে, তারপর তার মুখের দুই দিক চেপে ধরে বলবে, আমি তোমার সঞ্চিত ধন, আমি তোমার সম্পদ। তারপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

وَ لا يحسَبَنَّ الذين يَبْخَلون بِما آتاهم اللّٰه مِنْ فَضْلِه، هو خيرًا لهم، بل هو شَرٌّ لهم، سَيُطَوَّقون ما بَخِلوا به يومَ القِيامَة، وَ لِلّٰه مِيراثُ السمٰوٰتِ وَ الاَرْضِ و الله بِما تَعمَلون خَبير (التوبة : ٣٤ - ٣٥)

'আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহ দ্বারা যে মাল দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন মনে না করে যে, তা তাদের জন্য ভালো, না বরং তা তাদের জন্য অতি মন্দ। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করেছে, কিয়ামতের দিন তা দ্বারা তাদেরকে পেঁচানো হবে। আর আল্লাহরই জন্য আসমান ও যমীনের উত্তরাধিকার। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত।'

সুতরাং তোমার উপর যাকাত ফরয হলে অবশ্যই তুমি খুশী মনে যাকাত আদায় করবে। তাতে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে লাভবান হবে।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

০ যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত হলো ঃ ১. মুসলমান হওয়া ২. স্বাধীন হওয়া ৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ৪. সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া ৫. নিছাব পরিমাণ মালের পূর্ণ মালিক হওয়া ৬. নিছাব পরিমাণ মাল তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে

উদ্বৃত্ত হওয়া ৭. সক্রিয় ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া ৮. মাল বর্ধনযোগ্য হওয়া ৯. নিছাবের উপর চাঁদের হিসাবে বছর পূর্ণ হওয়া।[১]

সুতরাং কাফিরের উপর, গোলামের উপর, নাবালিগের উপর এবং অসুস্থমস্তিষ্কের উপর যাকাত নেই।

০ পূর্ণ মালিকানার অর্থ হলো মালের উপর অন্য কোন বান্দার হক না থাকা এবং মালিকের কবযায় ও নিয়ন্ত্রণে থাকা।

সুতরাং মোহর হাতে আসার আগে স্ত্রীর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা হাতে না আসায় তার কবযা ও নিয়ন্ত্রণ সাব্যস্ত হয় নি। আর কবযা ছাড়া মালিকানা পূর্ণ হয় না।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হাতে যে মাল আছে তাতে ঋণ পরিমাণ মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা এই মালের উপর তার কবযা ও নিয়ন্ত্রণ থাকলেও অন্য বান্দার হক যুক্ত হয়েছে।

০ মৌলিক প্রয়োজন অর্থ বেঁচে থাকার এবং জীবন ধারণের জন্য যা প্রয়োজন। যেমন– নিজের ও পোষ্যপরিজনের অন্ন, বস্ত্র, বাহন, বাসস্থান এবং আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহৃত অস্ত্র।

ঘরের আসবাবপত্র, পেশাজীবী মানুষের পেশাগত উপকরণ, আলিমের কিতাবসামগ্রীও মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত।

০ সক্রিয় ঋণ মানে বান্দার পক্ষ হতে যে ঋণের তাগাদা আছে। যেমন স্ত্রীর মোহর। সুতরাং মোহর বাদ দিলে যদি নিছাব না থাকে তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

বর্ধনশীল সম্পদ অর্থ (ক) পালিত পশু যা মাঠে চরে বেড়ে ওঠে এবং প্রজননের মাধ্যমে বৃদ্ধি লাভ করে, (খ) কিংবা স্বর্ণ-রোপা যাকে শারী'আত বর্ধনশীল বলে গণ্য করেছে। (গ) কিংবা ব্যবসা-পণ্য, যা মুনাফার মাধ্যমে বৃদ্ধি লাভ করে।

সুতরাং গবাদি পশু যদি বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চরে খায়,

---

১. الزكاةُ واجِبَةٌ على الحُرِّ المسلِمِ البَالِغِ العاقِلِ إذا مَلَكَ نِصابًا كامِلا مِلْكًا تامًّا و حَالَ عليه الحَوْلُ و ليس على صَبِيٍّ و لا مجنونٍ زكاةٌ.

মালিককে দানা-পানি কিনে খাওয়াতে না হয়, তাহলে সেগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা সেগুলো প্রকৃতই বর্ধনশীল সম্পদ।

তদ্রূপ ব্যবসা-পণ্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা মুনাফার মাধ্যম হওয়ার কারণে সেগুলো বর্ধনযোগ্য।

তদ্রূপ স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে, চাই তা মুদ্রারূপে সরকারী ছাপযুক্ত হোক বা না হোক এবং চাই তা অলংকার আকারে বা পাত্র আকারে হোক। কেননা ঘরে পড়ে থাকলেও শারী'আত এগুলোকে বর্ধনগুণসম্পন্ন মনে করেছে।

০ মণিমুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান পাথর ব্যবসা-পণ্য না হলে সেগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা তা বর্ধনশীল নয়, বর্ধনযোগ্যও নয় এবং বর্ধনগুণসম্পন্নও নয়।

০ বিভিন্ন মালের ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার নিছাবও বিভিন্ন। (সে আলোচনা পরে আসছে।)

কয়েকটি মাসআলা

১ – যখন নিছাব পরিমাণ মালের মালিক হবে তখন থেকেই বর্ষগণনা শুরু হবে। অর্থাৎ তখন থেকে বারটি চান্দ্রমাস পরে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য বছরের শুরুতে এবং শেষে নিছাব পূর্ণ থাকা যথেষ্ট, মাঝখানে নিছাব পূর্ণ থাকা জরুরী নয়। সুতরাং শুরুতে যদি মালের নিছাব পূর্ণ থাকে, তারপর নিছাব কমে যায়, পরে বছর শেষ হওয়ার আগে আবার নিছাব পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

২ – কোন সূত্রে তুমি নিছাব পরিমাণ মালের মালিক হলে এবং বর্ষগণনা শুরু হলো, কিছুদিন পর ঐ শ্রেণীর আরো কিছু মাল একই সূত্রে বা ভিন্ন কোন সূত্রে তোমার হাতে এলো, এক্ষেত্রে এই মাল আগের মালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ বছর পূর্ণ হওয়ার পর সমগ্রমালের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। পরবর্তী মালের উপর আলাদা বছর পূর্ণ হওয়া জরুরী নয়।

যদি মালের শ্রেণী ভিন্ন হয় তাহলে পরবর্তী মালের ক্ষেত্রে আলাদা বছর গণনা শুরু হবে।

৩ – যাকাত হলো আল্লাহর হক এবং তা উশুল করার হকদার হলেন শাসক। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এবং পরবর্তী দুই খলীফার যুগে শাসকের পক্ষ হতে সরকারীভাবে যাকাত উশুল করা হতো। কিন্তু তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে যখন মালের পরিমাণ বেড়ে গেলো এবং মালের খোঁজ-খবর নেয়া কঠিন হয়ে গেলো তখন মালের মালিককেই যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হলো। অর্থাৎ যাকাত আদায়ের ব্যাপারে মালের মালিক যেন শাসকের অকীল বা প্রতিনিধি হলো।

তবে আলিমগণ বলেছেন যে, এখনও যাকাত আদায়ের হকদার হলেন শাসক। সুতরাং কোন ব্যক্তি বা দল যাকাত আদায় না করলে তিনি বলপূর্বক যাকাত উশুল করতে পারবেন।

যাকাত আদায় করার পদ্ধতি

০ যাকাতের নিয়ত করতে হবে (ক) হকদারকে মাল দেয়ার সময়, (খ) কিংবা মাল বিতরণের জন্য নিযুক্ত অকীলের হাতে মাল অর্পণ করার সময়, (গ) কিংবা নিজের সম্পদ থেকে যাকাতের মাল পৃথক করার সময়। এ তিন সময়ের যে কোন এক সময় যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যদি এ তিন সময়ের কোন এক সময় নিয়ত না করে তাহলে যাকাত আদায় হবে না।[১]

০ যাকাতের নিয়ত ছাড়াই তুমি যদি হকদারকে মাল দিয়ে দাও, তারপর যাকাতের নিয়ত করো তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে, যদি নিয়ত করার সময় হকদারের হাতে মাল বিদ্যমান থাকে। নিয়ত করার আগেই যদি সে মাল খরচ করে ফেলে তাহলে যাকাত আদায় হবে না।

০ হকদারের জানার প্রয়োজন নেই যে, এটা যাকাতের মাল। সুতরাং

---

১. لايَجوز أداءُ الزكاةِ إلا بِالنيَّةِ، و يَجِب أن يَنْوِيَ الزكاةَ عِنْدَ دَفْعِ المال إلى الفَقير أو عندَ دفعِ المال إلى الوَكيلِ أو عندَ عَزْلِ الزكاة مِنَ المالِ .

তুমি যদি যাকাতের হকদারকে হাদিয়া বা করয বলে মাল দাও, আর যাকাতের নিয়ত করো তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে, বরং অনেক সময় এরকম কৌশল করা উত্তমও হয়ে থাকে।

○ তুমি যদি যাকাতের নিয়ত না করেই তোমার সমস্ত মাল দান করে দাও তাহলে তোমার যাকাত মাফ হয়ে যাবে।[১]

○ বছর পূর্ণ হওয়ার পর যাকাত আদায় করার আগেই যদি তোমার সমস্ত মাল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তোমার যাকাত মাফ হয়ে যাবে।[২] আর যদি আংশিক মাল নষ্ট হয় তাহলে সেই অনুপাতে যাকাত মাফ হয়ে যাবে। যেমন তোমার কাছে এক হাযার দিরহাম ছিলো, যাতে যাকাত আসে পঁচিশ দিরহাম। তা থেকে দু'শ দিরহাম নষ্ট হয়ে গেলো, তাহলে পাঁচ দিরহাম যাকাত মাফ হয়ে যাবে।

○ তুমি যদি কোন গরীবের কাছে তোমার পাওনা ঋণ যাকাতের নিয়তে মাফ করে দাও তাতে তোমার যাকাত আদায় হবে না। কেননা যাকাত আদায়ের জন্য মালিক বানানো দরকার, আর এখানে মালিক বানানো হয় নি, শুধু দায়মুক্ত করা হয়েছে।

কয়েকটি মাসাআলা

১ – যাকাত বিতরণের জন্য তুমি কাউকে অকীল নিযুক্ত করে তার হাতে যাকাতের মাল তুলে দিলে, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন মানুষকে দেয়ার কথা বললে না, এ অবস্থায় সে তার প্রাপ্তবয়স্ক গরীব সন্তানকে বা গরীব স্ত্রীকে তা দিতে পারে, কিন্তু নিজে গরীব হলেও তা নিতে পারে না। তবে তুমি যদি বলো যে, যাকে ইচ্ছা দান করতে পারো তাহলে সে নিজেও নিতে পারে।

২ – নিছাবের মালিক হওয়ার পর তুমি যদি কয়েক বছরের যাকাত আগাম দিয়ে দাও তাহলে জায়েয হবে। যেমন তুমি দু'শ দিরহামের মালিক হলে এবং বছর শেষে পাঁচ বছরের জন্য পঁচিশ দিরহাম দিয়ে দিলে তাহলে তা জায়েয হবে। কিন্তু

---

১. وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مالِه و لم يَنْوِ الزكاةَ سَقَطَ فرضُها عنه

২. وَ إذا هَلَكَ المالُ بعدَ تمام الحَوْلِ و قَبْلَ أداءِ الزكاة سَقَطتِ الزكاةُ

নিছাবের **মালিক হওয়ার** আগেই যদি আদায় করো তাহলে ছহী হবে না। **যেমন** একশ দিরহামের মালিক হয়ে তুমি পাঁচ **দিরহাম** আদায় করলে, তারপর দু'শ দিরহামের মালিক হলে এবং বছর পূর্ণ হলো, এ অবস্থায় আগের পাঁচ দিরহাম যথেষ্ট হবে না, বরং নতুনভাবে আদায় করতে হবে।

প্রশ্নমালা

১ – যাকাত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করো।

২ – زكاة এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বলো।

৩ – যাকাতের সামাজিক কল্যাণ কী বলো।

৪ – যাকাত ফরয হওয়ার শর্তগুলো আলোচনা করো।

৫ – যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নিছাব পরিমাণ মালের পূর্ণ মালিক হওয়া শর্ত। পূর্ণ মালিক হওয়ার অর্থ বলো এবং উদাহরণ দাও।

৬ – মৌলিক প্রয়োজন বলতে কী বোঝো?

৭ – তোমার আব্বার তিনটি বাড়ী আছে, একটিতে তোমরা থাকো, আর দু'টি বাড়ী খালি পড়ে আছে; এই বাড়ী দু'টির উপর যাকাত আসবে কি না এবং কেন?

৮ – তোমার আব্বার দশলাখ টাকা মূল্যের একটি গাড়ী আছে, অথচ তিন চার লাখ টাকা মূল্যের গাড়ীতেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায়, এ অবস্থায় ঐ গাড়ীর উপর যাকাত আসবে কি না এবং কেন?

৯ – তোমার পাওনাদারের কাছে তোমার স্বর্ণালংকারগুলো রিহন বা বন্ধক আছে। এ অবস্থায় তোমার উপর বা পাওনাদারের উপর ঐ অলংকারের যাকাত ওয়াজিব হবে কি না এবং কেন?

১০ – যাকাতের মাল বিতরণের অকীল কখন নিজের গরীব স্ত্রী-পুত্রকে ঐ মাল দিতে পারে এবং নিজেও নিতে পারে?

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত

০ স্বর্ণের ক্ষেত্রে যাকাতের নিছাব হলো বিশ مثقال (আধুনিক হিসাবে সাড়ে সাত তোলা বা ৮৫ গ্রাম) এবং রৌপ্যের ক্ষেত্রে নিছাব হলো দু'শ

দিরহাম (আধুনিক হিসাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা বা ৫৯৫ গ্রাম), আর যাকাতের পরিমাণ হলো চল্লিশভাগের একভাগ।[১]

সুতরাং তুমি যদি বিশ মিছকাল স্বর্ণের মালিক হও এবং বছর পূর্ণ হয় তাহলে তোমাকে অর্ধমিছকাল যাকাত দিতে হবে। আর যদি দু'শ দিরহামের মালিক হও তাহলে পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে।

০ ইচ্ছা করলে তুমি প্রচলিত মুদ্রায় হিসাব করে প্রচলিত মুদ্রায়ও যাকাত দিতে পারো, এমনকি মূল্য হিসাব করে সেই মূল্যের অন্য কোন জিনিসও যাকাত হিসাবে দিতে পারো।

০ স্বর্ণ বা রৌপ্যে মিশ্রিত খাদের পরিমাণ কম হলে এবং স্বর্ণ বা রৌপ্যের পরিমাণ বেশী হলে পুরোটাই স্বর্ণ বা রৌপ্য বলে গণ্য হবে, আর খাদের পরিমাণ বেশী হলে তা সাধারণ দ্রব্য বলে গণ্য হবে।

০ নিছাবের অতিরিক্ত স্বর্ণ বা রৌপ্যের উপর আনুপাতিক হারে যাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন অতিরিক্ত দশ মিছকাল হলে এক মিছকালের চারভাগের একভাগ ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ অতিরিক্ত একশ দিরহাম হলে আড়াই দিরহাম ওয়াজিব হবে।

কয়েকটি মাসআলা

১ – রূপার একটি পাত্রের ওজন একশ পঞ্চাশ দিরহাম, কিন্তু কারুকাজের কারণে তার মূল্য দু'শ দিরহাম, এক্ষেত্রে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ স্বর্ণের একটি পাত্রের ওজন পনের মিছকাল, কিন্তু কারুকাজের কারণে তার মূল্য বিশ মিছকাল, এক্ষেত্রে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

২ – যদি নিছাবের কম স্বর্ণ এবং নিছাবের কম রৌপ্য থাকে, কিন্তু দু'টোর মূল্য একত্র করলে একটি নিছাব পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে একত্র করে সেই নিছাবের যাকাত দিতে হবে। যেমন তোমার কাছে একশ দিরহাম আছে, আর একশ দিরহাম মূল্যের পাঁচটি দীনার আছে, তাহলে দীনারের মূল্য ধরে রৌপ্যের নিছাব পূর্ণ

---

১. تجب الزكاةُ في الذهَب و الفِضَّة إذا بَلغَ النِّصابَ، و نِصابُ الزكاة في الذهَبِ عِشرون مِثقالًا و في الفِضَّةِ مِأتَا دِرْهَمٍ، و مِقْدارُ الزَّكاةِ فيها رُبْعُ العُشْرِ .

করা হবে এবং তাতে পাঁচ দিরহাম যাকাত আসবে। কেননা এই হিসাব গরীবের জন্য কল্যাণকর।

৩ – তোমার কাছে স্বর্ণ বা রৌপ্য নেই, কাগুজে মুদ্রা আছে, যার মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমান, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

প্রশ্নমালা

১ – স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে যাকাতের নিছাব কী এবং যাকাত আদায়ের পরিমাণ কী?

২ – স্বর্ণালংকারের যাকাত স্বর্ণ দ্বারা না দিয়ে অন্য কিভাবে দেয়া যায়? উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলো।

৩ – নিছাবের কম স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকলে কী করণীয়, উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলো।

৪ – একবছর আগে তুমি বিশ মিছকাল ওযনের স্বর্ণপদক পুরস্কার পেয়েছো, এখন কি এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে?

৫ – তোমার কাছে শুধু পনের মিছকাল স্বর্ণ আছে, যার মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমান, এতে যাকাত ওয়াজিব হবে কি না বুঝিয়ে বলো।

৬ – তোমার কাছে পঁচিশ তোলা রূপা, আর পাঁচ তোলা স্বর্ণ থাকলে যাকাত ওয়াজিব হবে কি না বুঝিয়ে বলো।

দ্রব্যসামগ্রীর যাকাত

০ স্বর্ণ, রৌপ্য ও পালিত পশু ছাড়া আর যা কিছু দ্রব্য আছে সেগুলোকে যাকাতের পরিভাষায় عُروض বা দ্রব্যসামগ্রী বলে। পশু যদি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় তাহলে সেগুলোও দ্রব্যসামগ্রী বলে গণ্য হবে।[১]

০ عروض বা দ্রব্যসামগ্রীতে যদি ব্যবসার নিয়ত করা হয় এবং স্বর্ণ বা

---

১. ما سِوَى الذهَبِ و الفِضَّةِ و الحَيَوان فَهُو عَرْضٌ و جمْعه عُروض، و تَجِبُ الزكاةُ في عُروضِ التجارَةِ إذا بلَغَت قِيْمَتُها نِصابًا منَ الذهَبِ و الفضَّةِ .

রৌপ্যের হিসাবে নিছাব পরিমাণ হয় তাহলে বছর পূর্ণ হওয়ার পর সেগুলোর উপর যাকাত আসবে এবং যাকাতের পরিমাণ হবে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

০ দেশের প্রচলিত মুদ্রায় বাণিজ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

০ দোকান, দোকানের আসবাব এবং ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় উপকরণ নিছাবের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

০ তোমার মালিকানায় যদি জমি, বাড়ী, পশু বা অন্য কোন দ্রব্য থাকে আর সেগুলোতে ব্যবসার নিয়ত না করো তাহলে তাতে যাকাত আসবে না। পরে যদি ব্যবসার নিয়ত করো তবে নিয়তের সাথে সাথে যাকাতের বর্ষগণনা শুরু হবে না, বরং যখন কার্যত ব্যবসা শুরু করবে তখন থেকে বর্ষগণনা শুরু হবে। অর্থাৎ যখন এগুলো বিক্রি করবে তখন থেকে ঐ মূল্যের উপর বর্ষগণনা শুরু হবে।

০ ব্যবসার নিয়তে যখন কোন দ্রব্য ক্রয় করবে তখন থেকেই তা বাণিজ্য- দ্রব্য বলে গণ্য হবে এবং তখন থেকেই বর্ষ গণনা শুরু হবে।

০ ব্যবসার নিয়তে কোন দ্রব্য ক্রয়ের পর যদি তা ব্যবহারের নিয়ত করে ফেলো তাহলে তখন থেকেই তা বাণিজ্য-দ্রব্য থেকে খারিজ হয়ে যাবে।

কয়েকটি মাসআলা

১ – বাণিজ্য-দ্রব্যের বর্ষগণনা শুরু হওয়ার কয়েক মাস পর যদি তা অন্য দ্রব্য দ্বারা পরিবর্তন করা হয় তাহলে নতুন করে বর্ষগণনা শুরু হবে না, বরং আগের বর্ষগণনাই অব্যাহত থাকবে।

২ – যদি নিছাবের কম স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকে এবং নিছাবের কম বাণিজ্য-দ্রব্য থাকে তাহলে সেগুলোর একত্র মূল্য হিসাব করা হবে।

৩ – ব্যবসার নিয়তে ক্রয়ের পর যদি ব্যবহারের নিয়ত করা হয়, তারপর আবার ব্যবসায়ের নিয়ত করা হয় তাহলে দ্বিতীয় নিয়ত থেকে বর্ষগণনা শুরু করা হবে, প্রথম নিয়তের সময় থেকে নয়।

প্রশ্নমালা

১ – যাকাতের পরিভাষায় عُرُوض কাকে বলে?

২ – তুমি এবং তোমার বন্ধু মুহররম মাসে বসবাসের নিয়তে দু'টি বাড়ী ক্রয় করলে এবং এক মাস পর নিজ নিজ বাড়ী দ্বারা ব্যবসার নিয়ত করলে এবং যিলহজ্জ মাসের ত্রিশ তারিখে বিশ মিছকালের বিনিময়ে নিজ নিজ বাড়ী বিক্রি করলে; তোমার বন্ধুর উপর তো ঐ বিশ মিছকালের যাকাত দু'দিন পরই ওয়াজিব হয়ে গেলো, অথচ তোমার উপর ওয়াজিব হলো পরবর্তী যিলহজ্জ মাসের ত্রিশ তারিখে। কারণ ব্যাখ্যা করো।

৩ – ব্যবহারের দ্রব্যে ব্যবসায়ের নিয়ত করা এবং ব্যবসায়ের নিয়তে দ্রব্য ক্রয় করার মাঝে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য কী?

৪ – কাপড়ের ব্যবসা শুরু করার পাঁচ মাস পর কাপড় পরিবর্তন করে কাগজের ব্যবসা শুরু করা হলো; এই কাগজের উপর কখন যাকাত আসবে এবং কেন?

৫ – দোকানের হিসাবপত্রের জন্য একটি কম্পিউটর কেনা হলো, যার মূল্য পাঁচ মিছকাল স্বর্ণ, আর দোকানে বিক্রির জন্য দশ মিছকাল মূল্যের মাল তোলা হলো, বছর শেষে হিসাব করে দেখা গেলো, লাভ হয়েছে পাঁচ মিছকাল স্বর্ণের সমপরিমাণ, এই ব্যবসায়ীর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না বলো।

৬ – ঘরে স্বর্ণ আছে দশ মিছকাল পরিমাণ, আর দোকানে মাল আছে দশ মিছকাল পরিমাণ, বছর শেষে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে কি না বলো।

دَيْنٌ বা পাওনা মালের যাকাত

০ যাকাত আদায়ের সময় বিদ্যমান মালের সঙ্গে دين বা পাওনা মালের হিসাব যোগ হবে কি না এ সম্পর্কে শারী'আতের সিদ্ধান্ত এই যে, دين বা পাওনা তিন প্রকার। دين قَوِيٌّ (উত্তম পাওনা) دين مُتَوَسِّط (মধ্যম পাওনা) دين ضَعِيفٌ (দুর্বল পাওনা)

০ ঋণের পাওনা এবং ব্যবসায়ের পাওনা হলো উত্তম পাওনা, যদি দেনাদার তা স্বীকার করে, কিংবা পাওনাদার সাক্ষ্য দ্বারা তা প্রমাণ করতে পারে।

উত্তম পাওনার ক্ষেত্রে হুকুম এই যে, যদি তা নিছাব পরিমাণ হয় এবং বছর পূর্ণ হয় তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে উশুল হওয়ার আগে আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

০ উত্তম পাওনার ক্ষেত্রে বর্ষগণনা হবে মালের মালিক হওয়ার সময় থেকে, পাওনা উশুল করার সময় থেকে নয়। সুতরাং পুরোনো পাওনা উশুল হওয়ার পর বিগত বছরগুলোর যাকাত দিতে হবে।

আবু হানীফা (রহ) এর মতে চল্লিশ দিরহাম উশুল হওয়ার পর এক দিরহাম আদায় করা ওয়াজিব হবে, এর কম উশুল হলে তখন যাকাত আদায় করতে হবে না। আর ছাহেবায়নের মতে যে পরিমাণই উশুল হবে সেই অনুপাতে যাকাত আদায় করতে হবে।

০ ব্যবসার সূত্রে নয়, বরং মৌলিক প্রয়োজনীয় কোন জিনিস বিক্রির সূত্রে ক্রেতার কাছে যে পাওনা সেটাই হলো মধ্যম পাওনা।

০ মধ্যম পাওনার ক্ষেত্রে আবু হানীফা (রহ) এর মতে পূর্ণ নিছাব পরিমাণ উশুল করার পর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে, নিছাবের কম উশুল হলে সেটার যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

ছাহেবায়নের মতে যে পরিমাণই উশুল হবে সেই অনুপাতে যাকাত আদায় করতে হবে।

সুতরাং পাওনা যদি এক হাযার দিরহাম হয়, আর দু'শ দিরহাম উশুল হয় তাহলে পাঁচ দিরহাম যাকাত আদায় করতে হবে। একশ দিরহাম উশুল হলে আবু হানীফা (রহ) এর মতে তখন কিছু আদায় করতে হবে না। যখন আরো একশ উশুল হবে তখন পাঁচ দিরহাম আদায় করতে হবে। ছাহেবায়নের মতে তখনই আড়াই দিরহাম আদায় করতে হবে।

০ মধ্যম পাওনার ক্ষেত্রেও বর্ষগণনা হবে মালের মালিক হওয়ার সময় থেকে, পাওনা উশুল করার সময় থেকে নয়। সুতরাং বিগত বছরগুলোর যাকাতও আদায় করতে হবে। তবে আদায় করা ওয়াজিব হবে পাওনা উশুল করার পর।

পাওনা যদি কোন মালের বিনিময়ে না হয় তাহলে সেটা হলো دين ضعيف (বা দুর্বল পাওনা) যেমন স্বামীর কাছে স্ত্রীর পাওনা মোহর এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কিছাছের পরিবর্তে সন্ধির পাওনা এবং অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে দিয়তের পাওনা।

দুর্বল পাওনার ক্ষেত্রে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে নিছাব পরিমাণ মাল উশুল করার পর বছর পূর্ণ হওয়ার পর। সুতরাং বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

مَالُ الضِّمَارِ এর যাকাত

০ মালের মালিকানা আছে (ক) কিন্তু পাওয়ার আশা নেই, এমন মালকে مال الضمار বলে। যেমন– দেনাদার পাওনা অস্বীকার করে, আর পাওনাদারের সাক্ষ্য নেই, (খ) কিংবা সরকার মাল জব্দ করে নিয়েছে, (গ) কিংবা খোলা মাঠে পুতে রেখেছিলো, এখন জায়গা ভুলে গেছে, (ঘ) কিংবা নদীতে পড়ে গেছে।

০ মালে যিমার পাওয়া গেলে এক বছর পর তাতে যাকাত আসবে এবং বিগত বছরগুলোর যাকাত আসবে না।

০ যে মাল হাতছাড়া হয়ে গেছে, কিন্তু ফিরে পাওয়ার আশা আছে তা মালে যিমার নয়। যেমন কুয়ায় বা হাউযে পড়ে যাওয়া মাল, নিজের বা অন্যের বাড়ীতে পুতে রাখা মাল।

প্রশ্নমালা

১ – دين এর প্রকার ও পরিচয় বলো।

২ – دين قوي এর হুকুম আলোচনা করো।

৩ – دين قوي ও دين متوسط এর মিল ও অমিল আলোচনা করো।

৪ – دين متوسط ও دين ضعيف এর মিল ও অমিল আলোচনা করো।

৫ – مال الضمار এর পরিচয় ও উদাহরণ বলো।

৬ – مال الضمار এর হুকুম বলো।

৭ – নদীতে পড়া মাল যিমার হলে কুয়ায় পড়া মাল যিমার নয় কেন?

যাকাতের হকদার

কোরআনের 'নাছ'-এ আট শ্রেণীর লোককে যাকাতের হকদার ঘোষণা করা হয়েছে। 'নাছ' এই –

إِنَّما الصَّدَقات لِلفُقرآء وَ المساكين وَ العامِلِين عَليها، وَ المؤَلَّفَةِ قُلوبُهم، وَ في الرِّقاب وَ الغارمِينَ، و في سَبيل اللّٰه وَ ابنِ السَّبيلِ، فريضةً منَ اللّٰهِ، و اللّٰهُ عليم حَكيم

যাদেরকে দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য, কিংবা যাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মনোরঞ্জন করা হয় তারা হলো المؤلفة قلوبهم।

ইসলামের শুরুতে মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কিছু লোককে যাকাতের মাল দেয়া হতো। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাহাবা কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরকে যাকাত দেয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কেননা ইসলাম তখন শক্তি অর্জন করে ফেলেছিলো। সুতরাং এখন যাকাতের হকদার হলো সাত শ্রেণীর মানুষ এবং তাদের বিবরণ এই–

১. ফকীর বা দরিদ্র, অর্থাৎ যাদের উদ্বৃত্ত মালের পরিমাণ নিছাবের চেয়ে কম। এরা সুস্থ ও উপার্জনক্ষম হলেও যাকাতের হকদার।

২. মিসকীন বা নিঃস্ব অর্থাৎ যাদের কাছে কোন মাল নেই।

৩. 'আমিল, অর্থাৎ যাকাত এবং উশর উশুলের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। কাজ অনুযায়ী তাদের পারিশ্রমিক যাকাতের মাল থেকেই দেয়া হবে।

৪. الرقاب মানে মনিবের সঙ্গে কিতাবত চুক্তিতে আবদ্ধ গোলাম। বর্তমানে এই শ্রেণীটি পাওয়া যায় না, তবে যখন পাওয়া যাবে তখন তারা যাকাতের হকদার হবে।

৫. غريم অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যার ঋণ আদায়ের সামর্থ্য নেই, কিংবা ঋণ আদায়ের পর যে নিছাবের মালিক থাকে না।

সাধারণ দরিদ্রকে দেয়ার চেয়ে ঋণগ্রস্তকে ঋণ আদায়ের জন্য যাকাত দেয়া উত্তম।

৬. ফী সাবীলিল্লাহ মানে (ক) যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে নিয়োজিত হওয়ার কারণে জীবিকা থেকে বিচ্ছিন্ন, (খ) কিংবা যারা হজ্জের সফরে পাথেয়হারা হয়ে পড়েছে, (গ) কিংবা যারা দ্বীনী ইলম হাছিল

করতে গিয়ে জীবিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

৭. ইবনে সাবীল মানে ঐ মুসাফির যার বাড়ীতে মাল রয়েছে, কিন্তু সফরে আর্থিক সংকটে পড়েছে। তাকে সফর শেষ করার পরিমাণ যাকাত দেয়া হবে। সাত শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীকে যাকাত দেয়া যেতে পারে, আবার শুধু কোন এক শ্রেণীকেও দেয়া যেতে পারে।

কয়েকটি মাসআলা

১ – সফরে নয়, বরং নিজের দেশেই আছে, কিন্তু টাকা এমনভাবে আটকা পড়েছে যে, জীবিকা চালানো সম্ভব হচ্ছে না, এমন ব্যক্তিও ইবনে সাবীলের অন্তর্ভুক্ত।

২ – ইবনে সাবীলের জন্য প্রয়োজনের বেশী নেয়া জায়েয নয়, পক্ষান্তরে ফকীর ও মিসকীন প্রয়োজনের বেশীও নিতে পারে।

তবে প্রয়োজন শেষে ইবনে সাবীলের হাতে মাল থেকে গেলে তা সে ব্যবহার করতে পারে, তা ছাদকা করে দেয়া জরুরী নয়।

৩ – 'আমিল যা গ্রহণ করে তা যাকাত নয়, বরং তার কাজের মজুরি বা বিনিময়। এ জন্যই 'আমিল ধনী হলেও যাকাতের মাল থেকে গ্রহণ করতে পারে।

যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়

১. কোন কাফিরকে ২. কোন ধনীকে, হোক সে বালিগ বা না-বালিগ ৩. কোন হাশেমীকে ৪. স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে ৫. মা-বাবা এবং তাদের উর্ধ্বতন কাউকে, তদ্রূপ সন্তান এবং সন্তানের অধঃস্তন কাউকে।

এছাড়া অন্য যে কোন নিকটাত্মীয় যাকাতের হকদার হলে তাকে দেয়া শুধু জায়েয নয়, বরং উত্তম। কেননা তাতে আত্মীয়তার হক আদায়েরও ছাওয়াব হয়। নিকটাত্মীয়দের পর প্রতিবেশীকে যাকাত দেয়া উত্তম।

মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণের কাজে এবং রাস্তা-ঘাট ও পোল তৈরীর কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করা জায়েয নেই। কেননা এ সকল ক্ষেত্রে কাউকে মালিক বানানো হয় না। আর মালিক বানানো ছাড়া যাকাত আদায় হয় না।

০ কোন একজনকে পূর্ণ এক নিছাব পরিমাণ যাকাত দেয়া মাকরূহ। তবে ঋণগ্রস্তকে ঋণ আদায়-পরিমাণ যাকাত দেয়া যায়।

০ স্থানীয় গরীব-মিসকীনরাই যাকাতের বেশী হকদার। সুতরাং যাকাতের মাল অন্যত্র পাঠানো মাকরূহ। তবে নিজের আত্মীয়দের কাছে এবং অধিকতর প্রয়োজনগ্রস্তদের কাছে এবং অধিকতর নেক লোকদের কাছে এবং মুসলমানদের জন্য অধিকতর কল্যাণমূলক কাজে যাকাতের মাল পাঠানো মাকরূহ নয়।

কয়েকটি মাসআলা

১ – পিতার সচ্ছলতার কারণে তার না-বালিগ সন্তানও সচ্ছল বলে গণ্য হবে। কিন্তু বালিগ সন্তান পিতার সচ্ছলতার কারণে সচ্ছল বলে গণ্য হবে না।

তদ্রূপ সন্তানের সচ্ছলতার কারণে পিতা এবং স্বামীর সচ্ছলতার কারণে স্ত্রী সচ্ছল বলে গণ্য হবে না।

২ – যাকাতের মাল যথাক্রমে নিজের ভাই-বোন এবং তাদের সন্তানদেরকে, তারপর চাচা ও ফুফুকে, তারপর মামা ও খালাকে, তারপর মাহরাম আত্মীয়কে, তারপর প্রতিবেশীকে, তারপর নিজের মহল্লাবাসীকে, তারপর নিজের শহরবাসীকে প্রদান করা উত্তম।

প্রশ্নমালা

১ – যাকাতের হকদারসংক্রান্ত 'নাছটি' উল্লেখ করো।

২ – المؤلفة قلوبهم। সম্পর্কে কী জানো বলো।

৩ – যাকাতের হকদার সাতটি শ্রেণীর বিবরণ দাও।

৪ – মাইয়েতের দাফন-কাফনের কাজে এবং মাইয়েতের ঋণ আদায়ের কাজে যাকাতের মাল ব্যয় করা জায়েয নয় কেন?

৫ – সচ্ছল পিতার সন্তানকে যাকাত দেয়ার মাসআলা কী বলো?

৬ – কাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়, বলো।

ছাদাকাতুল ফিতর

০ ঈদুল ফিতরের দিন সচ্ছল মুসলমানের উপর অভাবীদের সাহায্য হিসাবে এবং রামাযানের রোযার ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে ছাদাকা ওয়াজিব করা হয়েছে তাকে ছাদাকাতুল ফিতর বলে।[১]

০ মৌলিক প্রয়োজনের[২] অতিরিক্ত এবং ঋণমুক্ত নিছাব পরিমাণ মালের অধিকারী যে কোন স্বাধীন মুসলমানের উপর ছাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব।

সুতরাং কাফিরের উপর এবং গোলামের উপর ছাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয়।

০ ছাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত নয়, কিন্তু যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য তা শর্ত। সুতরাং মাজনূন ও না-বালিগ ছাহিবে নিছাবের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না, কিন্তু ছাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। তাদের অভিভাবক তাদের মাল থেকে ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করবে।

০ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য নিছাবের বর্ষপূর্তি শর্ত, কিন্তু ছাদাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে বর্ষপূর্তি শর্ত নয়, বরং ঈদুল ফিতরের ফজর উদয়ের সময় ছাহিবে নিছাব হলেই তার উপর ছাকাদাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে।[৩]

০ ছাদাকাতুল ফিতরের وجوب এর সম্পর্ক হলো ঈদুল ফিতরের ফজর-উদয়ের সঙ্গে। সুতরাং ঐ ফজরের আগে যে মারা যায় বা নিছাবহীন হয়ে পড়ে তার উপর ছাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয়।

তদ্রূপ ফজরের পরে যে জন্মগ্রহণ করে বা নিছাবের মালিক হয় তার উপর ছাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব নয়।

---

১. صَدَقَةُ الفِطْرِ واجبَةٌ على الحُرِّ المسلِم الذي يَمْلِكُ نِصابًا فاضِلاً عن دَيْنِه و عَن حَوائِجه الأَصْلِيَّةِ و عَنْ حَوائِج عِيَالِه ·

২. الحوائِجُ الأصلِيَّةُ মৌলিক প্রয়োজনসমূহ।

৩. لا يُشْتَرَطُ لوُجوبِ صَدَقَةِ الفِطْرِ أن يحولَ الحَولُ الكامِلُ على النِّصاب، بل تجِبُ إذا كان صاحِبَ نِصابٍ يومَ العِيدِ وقتَ طُلوعِ الفَجْرِ ·

০ সময় হওয়ার আগে বা পরে ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করা যায়, তবে ঈদগাহে যাওয়ার আগে আদায় করা মুস্তাহাব, আর বিনা ওযরে ঈদের নামাযের পরে আদায় করা মাকরূহ।

০ ছাহিবে নিছাব ব্যক্তি নিজের পক্ষ হতে এবং নিজের দরিদ্র না-বালিগ সন্তানের পক্ষ হতে ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করবে।

না-বালিগ সন্তান ধনী হলে তার নিজের মাল থেকে ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করা হবে। বালিগ দরিদ্র সন্তানের পক্ষ হতে আদায় করা পিতার জন্য জরুরী নয়, তবে দরিদ্র বালিগ সন্তান অসুস্থমস্তিষ্ক হলে তার পক্ষ হতেও আদায় করা পিতার উপর ওয়াজিব হবে।

০ স্ত্রীর ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়।[১]

ছাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ

০ ছাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ হচ্ছে জনপ্রতি অর্ধ-ছা গম বা গমের আটা ও ছাতু, কিংবা একছা খেজুর বা যব। আধুনিক হিসাবে অর্ধ-ছা হচ্ছে প্রায় সোয়া দুই কিলো।

গমের পরিবর্তে তার মূল্য আদায় করাও জায়েয আছে, বরং সেটাই উত্তম, যাতে গরীব তার বিভিন্ন প্রয়োজনে তা ব্যয় করতে পারে।

০ একটি ছাদাকা কয়েকজন গরীবকে এবং কয়েকটি ছাদাকা একজন গরীবকে দেয়া জায়েয আছে।

যাকাতের হকদার যারা তারাই হলো ছাদাকাতুল ফিতরের হকদার।

কয়েকটি মাসআলা

১ – যাদের পক্ষ হতে ছাদাকা আদায় করা ওয়াজিব নয় তাদের পক্ষ হতে তাদের অনুমতি ছাড়াও আদায় করে দিলে জায়েয হবে।

২ – ঈদুল ফিতরের ফজরের পর নিছাব হালাক হয়ে গেলে ছাদাকা

---

১. يَجِب أن يُخرِجَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَنْ نَفْسِه و عَنْ أولادِه الصغار الفُقَراء، أمّا إذا كانوا أغْنِياءَ فَتُخرَجُ صَدَقةُ الفطرِ عن مالهم، و لا يجب على الرجُل أن يخرِجَ صدَقَة الفطر عن زَوْجته و عن أولاده الكِبار الفُقَراء ·

মাফ হয় না, অথচ বর্ষপূর্তির পর নিছাব হালাক হয়ে গেলে যাকাত মাফ হয়ে যায়।

৩ – রামাযানে ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করা যায়, বরং সেটাই উত্তম, যাতে গরীবরা ঈদের আনন্দে শরীক হতে পারে।

প্রশ্নমালা

১ – যাকাত ফরয হওয়া এবং ছাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার মাঝে দু'টি পার্থক্য রয়েছে, তা উল্লেখ করো।

২ – ঈদুল ফিতরের ফজরের আগে বা পরে ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ছাদাকাতুল ফিতরের মাসআলা কী?

৩ – রাশেদের দুই ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক ও গরীব, অথচ একজনের পক্ষ হতে ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করা রাশেদের উপর ওয়াজিব, অন্যজনের পক্ষ হতে ওয়াজিব নয়, এর কারণ কী?

৪ – কখন পিতাকে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পক্ষ হতে ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে হয়?

৫ – ছাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ সম্পর্কে যা জানো বলো।

ছিয়াম অধ্যায়

صوم বা صيام এর আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছু থেকে বিরত থাকা। শারী'আতের পরিভাষায় এর অর্থ হলো দ্বিতীয় ফজরের উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত করে পানাহার থেকে বিরত থাকা।[১]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يايها الذين اٰمَنوا كُتِب عليكم الصيامُ كما كتِب على الذين مِنْ قَبلِكم، لعلكم تَتَّقون (سورة البقرة)

হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর ছিয়ামকে ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিলো, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন–

فَمَنْ شَهِد منكم الشهرَ فَلْيَصُمْه

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই (রামাযান) মাসটি পাবে তারা যেন এই মাসে ছিয়াম পালন করে।

রামাযানের সিয়ামের ফরযিয়াত সম্পর্কে সমগ্র উম্মাহর ইজমা রয়েছে এবং তা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রোকন। সিয়ামের ফযীলত ও মরতবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, হাদীছে কুদসিতে এসেছে–

كلُّ عَمَلِ ابْنِ آدمَ له إلا الصومَ فهو لي وَ أنا أَجْزِيْ به

আদমের পুত্রের সমস্ত আমল তার জন্য, কিন্তু রোযা হলো আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং তার বিনিময় দান করবো।

---

١. الصومُ في اللغَةِ الإمْساكُ، و الصومُ في الشريعَةِ الإمساكُ عَنِ الأكْلِ و الشُّرْبِ من طُلوعِ الفَجْرِ إلى غُروبِ الشمس مَعَ النِّيَّةِ.

০ রামাযানের রোযা ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হলো মুসলমান হওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া এবং সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া।

সুতরাং কাফিরের উপর এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের উপর এবং অসুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তির উপর রামাযানের রোযা ফরয নয়।

০ মুসাফিরের উপর রামাযানে রোযা আদায় করা ফরয নয়, তবে রোযা রাখলে তা আদায় হয়ে যাবে। মুসাফিরের উপর ফরয হলো সফরের পরে তা কাযা করা। রোযা রাখতে সক্ষম নয় এমন অসুস্থ ব্যক্তি সম্পর্কেও একই কথা।

০ কারো উপর রামাযানের রোযার আদায় ফরয হওয়ার سبب বা কারণ হলো রামাযান মাসের দিন-রাতের কোন একটি অংশ পাওয়া। সুতরাং মাজনূন যদি রামাযানের কোন এক সময় সুস্থ হয়ে আবার মাজনূন হয়ে যায় তাহলে তাকে রামাযানের রোযা কাযা করতে হবে।[১]

০ রামাযানের প্রতিটি দিন সেই দিনের রোযার 'আদায়' ফরয হওয়ার জন্য سبب বা কারণ। সুতরাং রামাযানের মাঝে যদি কেউ প্রাপ্তবয়স্ক হয় বা মুসলমান হয় তাহলে তাকে পরবর্তী রোযাগুলো আদায় করতে হবে, পূর্ববর্তী রোযাগুলো কাযা করতে হবে না।

০ রোযা ছহী হওয়ার জন্য শর্ত হলো নিয়তের জন্য নির্ধারিত সময়ে রোযার নিয়ত করা। মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা শর্ত নয়, বরং নিয়তের স্থান হলো কল্‌ব। অর্থাৎ দিলে দিলে রোযা রাখার দৃঢ় ইচ্ছা করা জরুরী।

১. রামাযানের রোযা ২. নির্ধারিত নযরের রোযা ৩. এবং নফল রোযার ক্ষেত্রে রাত্র থেকে যাওয়াল পর্যন্ত যে কোন সময় নিয়ত করা ছহী। তবে রাত্রে নিয়ত করা এবং নির্ধারিত রোযার নিয়ত করা হলো উত্তম।

এই তিন রোযা নির্দিষ্ট নিয়ত দ্বারা যেমন ছহী হবে তেমনি সাধারণ নিয়ত দ্বারাও ছহী হবে।

সাধারণ নিয়ত মানে রোযার প্রকার নির্ধারণ না করে শুধু রোযার নিয়ত করা। আর নির্দিষ্ট নিয়ত মানে রোযার প্রকার নির্ধারণ করে নিয়ত করা।

---

১. سَبَبُ وجوبِ صِيامِ رمَضانَ شُهودُ جُزْءٍ منه، و كلُّ يومٍ من أيامِ رمضانَ سَبَبٌ لِوُجوبِ أداءِ صَوْمِ ذلك اليومِ .

১. রামাযানের কাযা রোযা ২. নষ্ট হওয়া নফল রোযার কাযা ৩. কাফফারার রোযা ৪. এবং অনির্ধারিত নযরের রোযার ক্ষেত্রে রাত্রে নিয়ত করা এবং নির্ধারিত রোযার নিয়ত করা শর্ত।

কয়েকটি মাসআলা

১ – মুসলিম দেশের বাসিন্দা রোযা ফরয হওয়ার বিধান না জানলেও তার উপর রোযা ফরয হবে। কেননা মুসলিম দেশে অজ্ঞতা ওযর নয়। অমুসলিম দেশের বাসিন্দা রোযা ফরয হওয়ার বিধান না জানলে তার উপর রোযা ফরয হবে না। কারণ অমুসলিম দেশে অজ্ঞতা হচ্ছে ওযর।

২ – যে কোন রোযার ক্ষেত্রে রাত্রে নিয়ত করার পর রোযার সময় শুরু হওয়া পর্যন্ত নিয়ত অব্যাহত থাকা শর্ত। সুতরাং যদি রাত্রে নিয়ত করার পর ফজর উদয়ের আগে নিয়ত বাদ দেয় তাহলে সে রোযাদার হবে না। সময় শুরু হওয়ার আগে যদি আবার নিয়ত করে নেয় তাহলে রোযা হয়ে যাবে।

৩ – যে সকল রোযায় যাওয়ালের আগ পর্যন্ত নিয়ত করার সুযোগ রয়েছে সেখানে শর্ত হলো, রোযার প্রথম সময় থেকে রোযা রাখার নিয়ত করা এবং নিয়তপূর্ব সময়ে ইচ্ছায় বা ভুলে রোযা ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত না হওয়া ।

সুতরাং যদি ফজরের পর নিয়ত করে এবং তখন থেকে রোযা রাখার নিয়ত করে তাহলে সে রোযাদার হবে না।

তদ্রূপ যদি ফজরের পর নিয়ত করে এবং তার আগে ইচ্ছায় বা ভুলে পানাহার করে ফেলে তাহলে সে রোযাদার হবে না।

৪ – উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্তী অঞ্চলে রাত্র হয় মাত্র কয়েক মিনিটের। আবার কোন কোন মেরু অঞ্চলে রাত্র ও দিন হয় ছয় মাস করে। সেসব অঞ্চলে সময়ের হিসাব করে রোযা রাখতে হবে।

রোযার বিভিন্ন প্রকার

রোযা মোট ছয় প্রকার–

১. ফ[illegible] ২. ওয়াজিব ৩. মাসনূন ৪. মুস্তাহাব ৫. মাকরূহ ৬. হারাম।

রামাযানের রোযা হলো ফরয। আর ওয়াজিব রোযা হলো তিনটি–

১. নষ্ট হওয়া নফল রোযার কাযা ২. নযর বা মান্নাতের রোযা ৩. বিভিন্ন কাফফারার রোযা।

মাসনূন রোযা হলো নয় তারিখ বা এগার তারিখসহ আশুরার রোযা।

মুস্তাহাব রোযা ছয়টি–

১. প্রতি মাসে যে কোন তিনদিনের রোযা। ২. প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা। (এই তিনদিনকে আইয়ামে বীয বলে।) ৩. প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা। ৪. শাওয়াল মাসের ছয় রোযা। ৫. অ-হাজীদের জন্য আরাফা দিবসের (যিলহজ্জের নয় তারিখের) রোযা। ৬. একদিন পর পর রোযা রাখা। এভাবে রোযা রাখা আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম ও সবচে' প্রিয়। এটাকে ছাওমে দাউদ বলে। কেননা আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আঃ) এভাবে রোযা রাখতেন।

মাকরূহ রোযা তিনটি– ১. আগের বা পরের দিন ছাড়া শুধু আশুরার দিন রোযা রাখা। ২. আগের বা পরের দিন ছাড়া শুধু শনিবার বা শুধু রবিবার রোযা রাখা। ৩. মাঝে ইফতার না করে লাগাতার দু'দিন রোযা রাখা।

হারাম রোযা হলো দুই ঈদের দিনে এবং আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখা (আইয়ামে তাশরীক হলো যিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ।)

কয়েকটি মাসআলা

১ – নযর মানে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের উপর কোন রোযা ধার্য করা। যেভাবে ধার্য করবে সেভাবেই রোযা রাখতে হবে। সুতরাং নির্ধারিত দিনের নিয়ত করলে ঐ নির্ধারিত দিনেই রোযা রাখতে হবে। যেমন বললো, আল্লাহর জন্য অমুক দিন বা অমুক অমুক দিন রোযা রাখবো। ঐ নির্ধারিত দিনে রোযা না রাখলে

পরে তা কাযা করা ওয়াজিব হবে।

আর দিন নির্ধারণ না করলে যে কোন দিন রোযা রাখতে পারে। যেমন বললো, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একটি বা দু'টি রোযা রাখবো।

২ – ওযর ছাড়া নফল রোযা ভঙ্গ করা জায়েয় নেই।

মেহমান বা মেযবানের মন রক্ষা করা ওযর বলে গণ্য হবে। তবে দুপুরের পর একারণে রোযা ভাঙ্গা যাবে না।

মা-বাবার আদেশ রক্ষা করা ওযর বলে গণ্য হবে এবং একারণে দুপুরের পরও রোযা ভাঙ্গা যাবে, তবে আছরের পরে নয়।

৩ – শুধু আশুরার দিনে বা শুধু শনিবারে বা শুধু রবিবারে রোযা রাখা মাকরূহ হওয়ার কারণ এই যে, তাতে ইহুদীদের সঙ্গে মিল হয়। কেননা ঐ দিনে ইহুদীরা রোযা রেখে থাকে।

প্রশ্নমালা

১ – صوم এর পরিচয় বলো।

২ – রোযা ফরয হওয়ার শর্ত কী কী?

৩ – রাত্রেই নিয়ত করা শর্ত কোন্ কোন্ রোযায়?

৪ – যাওয়ালের আগ পর্যন্ত নিয়ত করা যায় কোন্ কোন্ রোযায়?

৫ – যাওয়ালের আগে নিয়ত করা ছহী হওয়ার জন্য শর্ত কী?

৬ – রামাযানের রাতে একজন নিয়ত করলো, আমি আগামীকাল রোযা রাখবো, আরেকজন নিয়ত করলো আমি আগামীকাল নফল রোযা রাখবো, আরেকজন নিয়ত করলো, আমি আগামীকাল রামাযানের রোযা রাখবো; এখন কার নিয়তের কী হুকুম?

৭ – রামাযানের যে দিনে কেউ মুসলমান হলো সেই দিনের রোযা তাকে কাযা করতে হবে কি না এবং কেন?

৮ – মাসনূন রোযা কী কী?

৯ – মাকরূহ রোযা কী কী?

চাঁদ দেখা

রোযার সম্পর্ক হলো চান্দ্রমাসের সঙ্গে। আর চান্দ্রমাস উনত্রিশ দিনের হবে, কিংবা ত্রিশ দিনের। এর বেশী বা কম হতে পারে না। সুতরাং শা'বান মাসের উনত্রিশের দিবাগত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা গেলে রামাযান শুরু হয়ে যাবে। আর দেখা না গেলে শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর রামাযান শুরু হবে।

এ সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

صُوموا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِروا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عليكم فَأَكْمِلوا عِدَّةَ شعبانَ ثلاثِينَ

তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা শেষ করো। আর যদি 'মেঘাচ্ছন্ন হও' তাহলে শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও। (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং শা'বান মাসের উনত্রিশের দিবাগত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা হলো মুসলমানদের উপর ফরযে কেফায়া।

০ মেঘ, ধোঁয়া বা কুয়াশার কারণে আকাশ অপরিষ্কার থাকলে একজন প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক ও মুসলিম পুরুষ বা স্ত্রীলোকের খবরে রামাযানের চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হয়ে যাবে, খবরদাতা عادل বা ধর্মপরায়ণ না হলেও।

০ আর ঈদের চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হবে দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারা। সুতরাং সাক্ষ্যদানের জন্য عادل বা ধর্মপরায়ণ হওয়া জরুরী।

০ আকাশ পরিষ্কার থাকলে রামাযানের চাঁদ এবং ঈদের চাঁদ এই পরিমাণ লোকের দেখা দ্বারা সাব্যস্ত হবে, যাদের সত্যতা সম্পর্কে প্রবল ধারণা হয়।

০ অন্যান্য মাসের চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হবে ন্যায়পরায়ণ দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারা।

০ কোন অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে পার্শ্ববর্তী ঐ সকল অঞ্চলেও চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হয়ে যাবে, যাদের 'উদয়ক্ষেত্র' অভিন্ন। তবে শর্ত এই যে, তাদের কাছে শরীয়তসম্মত উপায়ে চাঁদ দেখার খবর পৌঁছতে হবে।

০ এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা রামাযান সাব্যস্ত হওয়ার পর যদি ত্রিশ দিন পার হয়ে যায় এবং পরিষ্কার আকাশেও চাঁদ দেখা না যায় তাহলে রামাযান শেষ হবে না এবং ঈদ করা জায়েয হবে না।

আর যদি দু'ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে রামাযান শেষ হয়ে যাবে।

০ কেউ যদি একা রামাযানের চাঁদ দেখে, আর শাসক তার খবর গ্রহণ না করেন তাহলেও তার জন্য রোযা রাখা জরুরী হবে।

০ কেউ যদি একা ঈদের চাঁদ দেখে, আর শাসক তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করেন তাহলে তার জন্য রোযা রাখা জরুরী হবে, রোযা শেষ করা জায়েয হবে না।

কয়েকটি মাসআলা

১ – রামাযানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে শুধু খবর দেয়া যথেষ্ট, সাক্ষ্য দেয়া জরুরী নয়। অর্থাৎ 'আমি চাঁদ দেখেছি' বলাই যথেষ্ট: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি চাঁদ দেখেছি' – এটা বলা জরুরী নয়। সুতরাং খবরদাতার عادل হওয়া শর্ত নয়।

পক্ষান্তরে ঈদের চাঁদের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেয়া জরুরী, শুধু খবর দেয়া যথেষ্ট নয়। সুতরাং সাক্ষ্যদাতার عادل হওয়া জরুরী। কারণ ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

২ – কেউ যদি রামাযানের চাঁদ দেখে তাহলে তার কর্তব্য হলো রাত্রেই শাসককে চাঁদ দেখার খবর দেয়া, যাতে মানুষের প্রথম রোযা নষ্ট না হয়। যদি কোন লোকালয়ে শাসক বা তার প্রতিনিধি না থাকে তাহলে সেই লোকালয়ের মসজিদে গিয়ে খবর দিতে হবে।

খবরদাতা যদি عادل বা مَسْتُوْرُ الحالِ (অজ্ঞাত অবস্থার লোক) হয় তাহলে তার খবরে ঐ লোকালয়ের সবার রোযা রাখা জরুরী হবে।

৩ – যে লোকালয়ে শাসক বা তার প্রতিনিধি নেই সেখানে দু'জন ন্যায়পরায়ণের খবর দ্বারাই চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

প্রশ্নমালা

১ – কখন চাঁদ দেখা ছাড়াই রামাযান সাব্যস্ত হয়ে যাবে?

২ – রোযা শুরু করা ও শেষ করা সম্পর্কে হাদীছটি বলো।

৩ – অপরিষ্কার আকাশে রামাযানের এবং ঈদের চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হওয়ার মাঝে পার্থক্য কী?

৪ – অমুসলিমের চাঁদ দেখার খবরে রামাযান সাব্যস্ত হবে কি না?

৫ – চাঁদ দেখার বিষয়ে আকাশ পরিষ্কার থাকা ও না থাকার পার্থক্য আলোচনা করো।

৬ – যে রামাযানের চাঁদ দেখেছে তার কর্তব্য কী?

৭ – তুমি রামাযানের বা ঈদের চাঁদ দেখার খবর দিলে, কিন্তু শাসক তা গ্রহণ করলেন না, এ অবস্থায় আগামীকাল তুমি কী করবে?

৮ – ত্রিশ রোযার পর শাওয়ালের চাঁদ দেখা না গেলে কী করণীয়?

৯ – কোন এক দেশে চাঁদ দেখা গেলে কি অন্যান্য দেশের মুসলমানদের জন্য রামাযান সাব্যস্ত হবে? এর কী হুকুম ?

يومُ الشَّكِّ বা সন্দেহের দিনের মাসআলা

০ শা'বানের উনত্রিশের দিবাগত সন্ধ্যায় আকাশ অপরিষ্কার থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে পরবর্তী দিনকে يوم الشك বলে। কেননা তখন নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, পরবর্তী দিনটি কি শা'বানের ত্রিশতম দিন, না রামাযানের প্রথম দিন।[১]

০ পরিষ্কার আকাশে চাঁদ দেখা না গেলে পরবর্তী দিনটি يوم الشك নয়, বরং নিশ্চিতই তা শা'বানের ত্রিশতম দিন।

০ সন্দেহের দিন রামাযানের নিয়তে রোযা রাখা মাকরূহে তাহরীমী এবং এই নিয়তে রোযা রাখাও মাকরূহে তাহরীমী যে, আগামীকাল রামাযান হলে ফরয রোযা রাখবো, আর শা'বান হলে নফল রাখবো।

---

১. يَوْمُ الشكِّ هو اليومُ الذي بَعد التاسِع و العشرين مِنْ شعبانَ إذا لم يُعْلَمْ عن طُلوع الهِلال .

উভয় ক্ষেত্রে যদি পরবর্তী দিনটি রামাযান বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তা রামাযানের রোযা বলেই গণ্য হবে, অন্যথায় নফল হবে, যদিও তা মাকরূহ।

যদি শুধু নফলের নিয়ত করে রোযা রাখে তাহলে মাকরূহ হবে না। এ অবস্থায় যদি পরবর্তী দিনটি রামাযান বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তা রামাযানের রোযা বলেই গণ্য হবে, অন্যথায় নফল হবে।

যদি নিয়ত করে যে, আগামীকাল রামাযান হলে রোযা রাখলাম, আর শা'বান হলে রোযা রাখলাম না তাহলে সে রোযাদারই হবে না।

কয়েকটি মাসআলা

১ – এক ব্যক্তির চাঁদ দেখার খবর কিংবা দুই ফাসেক ব্যক্তির চাঁদ দেখার সাক্ষ্য যদি 'রদ' করে দেয়া হয় তাহলেও পরবর্তী দিনটি يوم الشك হবে।

২ – সন্দেহের দিনে সাধারণ লোকদের কর্তব্য হলো রোযার নিয়ত ছাড়া যাওয়াল পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং চাঁদের খবর না হলে যাওয়ালের পর আহার গ্রহণ করা।

আর যারা নিয়তের পার্থক্য বুঝতে পারে তাদের কর্তব্য হলো নফলের নিয়তে রোযা রাখা। যদি চাঁদের খবর আসে তাহলে তো ফরয রোযা হয়ে যাবে, নতুবা নফলই হবে।

৩ – রোযার নিয়ত ছাড়া অপেক্ষার অবস্থায় যদি অপেক্ষার কথা ভুলে কিছু খেয়ে ফেলে, আর যাওয়ালের আগে চাঁদের খবর আসে এবং রোযার নিয়ত করে তাহলে রোযা হয়ে যাবে।

প্রশ্নমালা

১ – يوم الشك এর পরিচয় দাও।

২ – সন্দেহের দিন কী নিয়তে রোযা রাখা মাকরূহ?

৩ – সন্দেহের রোযা রাখার পর চাঁদের খবর আসার কী হুকুম?

৪ – সন্দেহের দিনে করণীয় কী?

কখন রোযা ভঙ্গ হয় না

০ রোযাদার যদি রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করে ফেলে তাহলে রোযা ভঙ্গ হয় না।[১]

০ পরিহার করা সম্ভব নয় এমন কিছু অনিচ্ছায় হলকের ভিতরে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হবে না। যেমন ধোঁয়া, আটার কলের উড়ন্ত ধূলা, ঔষধের দোকান বা কারখানায় ঔষধের স্বাদ ইত্যাদি।

০ যদি অনিচ্ছায় কানের ছিদ্র পথে পানি চলে যায় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না, তবে ইচ্ছা করে পানি প্রবেশ করালে রোযা ভঙ্গ হবে। তদ্রূপ যদি কানে ঔষধ বা তেল ঢালে তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে। নাকে ঔষধ দিয়ে টেনে নিলেও রোযা ভঙ্গ হবে।

০ কুলির পর মুখের ভিতরে যে আর্দ্রতা থেকে যায় তা থুথুর সঙ্গে গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবে না। নাকের সর্দি ইচ্ছাকৃতভাবে ভিতরে টেনে নিয়ে গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবে না।

০ যদি অনিচ্ছায় বমি এসে পড়ে এবং নিজে নিজেই ভিতরে চলে যায় তাহলে পরিমাণে বেশী হলেও রোযা ভঙ্গ হবে না।

যদি ইচ্ছা করে মুখে বমি আনে, আর ভরমুখ থেকে কম হয় এবং নিজে নিজেই ভিতরে চলে যায় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। (তবে বমি ইচ্ছা করে গিলে ফেললে সর্বাবস্থায় রোযা ভঙ্গ হবে।)

০ দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা চনার চেয়ে ছোট খাদ্যকণা খেয়ে ফেললে রোযা ভঙ্গ হবে না।

তিলের মত ক্ষুদ্র খাদ্যকণা যদি মুখে নিয়ে চাবায় এবং তা মুখেই মিশে যায়, হলকের ভিতরে তার স্বাদ না যায় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

০ সুঁই মাংসে দেয়া হোক কিংবা শিরায় তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না।

রোযার কাফফারা

কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হবে যদি রামাযান মাসে–

১ – শরীয়তসম্মত ওযর ছাড়া পানাহার করে বা ঔষধ সেবন করে।

---

১. لا يفسد الصوم إذا أكل أو شرب ناسيًا

২ – গম বা সেই পরিমাণ কোন দানা চিবিয়ে বা গিলে খায়।

৩ – তিল বা সেই পরিমাণ কোন দানা গিলে খেয়ে ফেলে।

৪ – ধূমপান করে বা কোন ধোঁয়া গ্রহণ করে।

৫ – মাটি খাওয়ায় অভ্যস্ত হয় এবং মাটি খায়

এসকল ক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কাযা ও কাফফারা দু'টোই ওয়াজিব হবে।

০ রামাযানের আদায় রোযা ভঙ্গ করলেই শুধু কাফফারা ওয়াজিব হয়। রামাযান ছাড়া অন্য কোন রোযা এবং রামাযানের কাযা রোযা ভঙ্গ করা দ্বারা কাফফরা ওয়াজিব হয় না, শুধু কাযা ওয়াজিব হয়।

শুধু কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না, যদি –

১ – শরীয়তসম্মত ওযরের কারণে বা বলপ্রয়োগের কারণে বাধ্য হয়ে পানাহার করে

২ – ভুল করে সময়ের আগে বা পরে পানাহার করে

৩ – সাধারণত খাওয়া হয় না এবং তা দ্বারা পেটের চাহিদা পূর্ণ হয় না, এমন কিছু যদি খায় (যেমন আটা, আটার দলা, তুলা, কাগজ, এবং শরীয়তসম্মত ওযরের কারণে সেবনকৃত ঔষধ এবং অভ্যাস ছাড়া খাওয়া মাটি এবং একসঙ্গে খাওয়া প্রচুর লবণ)

৪ – কোন অখাদ্য গিলে ফেলে; যেমন পাথরকণা, লৌহখণ্ড, রৌপ্য ও স্বর্ণখণ্ড, তামা ইত্যাদি

৫ – কুলি বা গরগরা করার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে হলকের ভিতরে পানি চলে যায়।

৬ – দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা চনা পরিমাণ খাদ্য গিলে ফেলে।

৭ – ভুলে পানাহার করার পর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে।

৮ – যদি রাত্রে নিয়ত করার পরিবর্তে দিনে নিয়ত করে এবং তারপর পানাহার করে।

৯ – যদি মুসাফির অবস্থায় সকাল করার পর মুকীম হওয়ার নিয়ত করে, তারপর পানাহার করে, তদ্রূপ যদি মুকিম অবস্থায় সকাল

করার পর মুসাফির হয়, তারপর পানাহার করে

১০ – যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভরা বমি করে

১১ – যদি রোযা রাখার বা না রাখার কোন নিয়ত ছাড়াই সারা দিন পানাহার থেকে বিরত থাকে

১২ – যদি কানে বা নাকে তেল, পানি বা ঔষধ প্রবেশ করায়

১৩ – যদি পেটের বা মাথার জখমে ঔষধ দেয় আর তা পেটের ভিতরে বা মস্তিষ্কে প্রবেশ করে

এসকল ছূরতে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে, তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

০ কাফফারা হচ্ছে প্রথমত একটি গোলাম আযাদ করা। তা সম্ভব না হলে দ্বিতীয়ত লাগাতার দু'মাস রোযা রাখা। (মাঝখানে ঈদের দিন ও আইয়ামে তাশরীক যেন না থাকে।) তা সম্ভব না হলে তৃতীয়ত ষাটজন গরীবকে দু'বেলা ভরপেট আহার করানো।

কাফফারা আদায়কারী সাধারণত যে খাবার খায় সেই মানের খাবার দেয়া জরুরী।

আর যদি খাবার দিয়ে দিতে চায় তাহলে প্রত্যেক গরীবকে অর্ধ-ছা' গম বা আটা কিংবা এক ছা' জব অথবা খেজুর দিতে হবে। মূল্য প্রদান করাও জায়েয, বরং সেটাই উত্তম।

কয়েকটি মাসআলা

১ – রোযাদার যদি ভুলে পানাহার করতে থাকে, আর সে যদি যুবক ও সবল হয় তাহলে তাকে রোযার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত, পক্ষান্তরে বৃদ্ধ ও দুর্বল হলে স্মরণ করানো উচিত নয়।

২ – কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে মূলকথা এই যে, যদি এমন কিছু খেয়ে বা পান করে রোযা নষ্ট করে, যা রুচিকে আকৃষ্ট করার মত, বা ক্ষুধা দূর করার মত, বা শরীর ঠিক করার মত তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে।

পানাহারের দ্রব্যটি যদি রুচিকে আকৃষ্ট করার মত বা ক্ষুধা দূর

করার মত বা শরীর ঠিক করার মত না হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হলেও কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

সুতরাং লবণ সামান্য পরিমাণে খেলে কাফফারা ওয়াজিব হবে, কিন্তু বেশী পরিমাণে খেলে ওয়াজিব হবে না।

শরবত খেলে কাফফারা ওয়াজিব হবে, কিন্তু পচা পানি পান করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

৩ – কাফফারার রোযা যদি মাসের প্রথম দিন থেকে শুরু করে তাহলে দুই মাস রোযা রাখবে এবং তা ৫৮ দিন, ৫৯ দিন এবং ৬০ দিন হতে পারে। আর যদি মাসের শুরু থেকে না রাখে তাহলে মোট ষাটদিন রোযা রাখতে হবে।

৪ – কাফফারার তরতীব রক্ষা করা অপরিহার্য। অর্থাৎ গোলাম আযাদ করতে সক্ষম অবস্থায় রোযা চলবে না, এবং রোযা রাখতে সক্ষম অবস্থায় গরীবকে খাওয়ানো চলবে না।

৫ – এমন গরীবকে খাওয়ানো যথেষ্ট হবে না যার ভরণ-পোষণ তার যিম্মায় জরুরী। যেমন মা-বাবা ও স্ত্রী-সন্তান। (তবে ভরণ-পোষণের বাইরে আলাদাভাবে খাদ্য বা তার মূল্য প্রদান করা যাবে।)

৬ – কোন কারণে রোযা ভঙ্গ হলে রোযার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তার কর্তব্য হলো অবশিষ্ট দিন পানাহার থেকে বিরত থাকা।

প্রশ্নমালা

১ – তুমি ভিড়ের মধ্যে বসে আছো, আর সিগারেটের ধোঁয়া তোমার নাকে প্রবেশ করছে, এ অবস্থায় তোমার রোযা ভঙ্গ হবে কি না এবং কেন?

২ – বমি দ্বারা রোযা ভঙ্গ হওয়া না হওয়ার বিষয়টি বলো।

৩ – পরিহার করা সম্ভব নয় এমন কিছু হলকের ভিতরে চলে যাওয়ার উদাহরণ দাও।

৪ – দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা গোশত মুখ থেকে বের করে আবার মুখে দিয়ে খেয়ে ফেললে তার কী হুকুম?

৫ – লবণ কম-বেশীতে রোযা ভাঙ্গা ও না ভাঙ্গার কারণ বলো।

৬ – একজন ধূমপান করলো, আরেকজন ইচ্ছে করে ধোঁয়াপূর্ণ স্থানে গেলো এবং শ্বাস নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লো, এ অবস্থায় কার কী হুকুম?

৭ – রামাযানের একটি কাযা রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেললো, এতে কাফফারা ওয়াজিব হবে কি না এবং কেন?

৮ – সময় হয়ে গেছে ভেবে সময়ের আগে ইফতার করে ফেললে তার কী হুকুম এবং কেন?

৯ – রোযার কাফফারা কী এবং কাফফারার তারতীবের কী অর্থ?

১০ – কাফফারার জন্য গরীবকে আহার করালে কী হুকুম এবং খাদ্য প্রদান করলে কী হুকুম?

১১ – একজন রোযাদারকে ভুলে খেতে দেখলে তুমি কী করবে?

১২ – দু'জনকে বন্দুক ধরে রোযা ভাঙ্গতে বলা হলো। তখন একজন সামান্য পরিমাণ লবণ খেয়ে রোযা ভঙ্গ করলো; দ্বিতীয়জন বেশী পরিমাণ লবণ খেলো, এখন কার উপর শুধু কাযা ওয়াজিব এবং কার উপর কাযা ও কাফফারা দু'টোই ওয়াজিব?

১৩– একই ঔষধ একজন চিকিৎসার প্রয়োজনে সেবন করলো, অন্যজন বিনা প্রয়োজনে সেবন করলো, এখন কার কী হুকুম?

১৪ – কাফফারার রোযা ৫৮ দিন হওয়ার ছূরত কী বলো।

রোযাদারের জন্য যা মাকরূহ এবং যা মাকরূহ নয়

০ বিনা প্রয়োজনে কোন কিছু চাবানো বা চাখা মাকরূহ। মুখে থুথু জমা করে গিলে ফেলা মাকরূহ। শারীরিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয় এমন কিছু করাও মাকরূহ। যেমন শিঙ্গা লাগানো এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের কাজ করা এবং ছাওয়াবের আশায় অনেক দূরের মসজিদে হেঁটে যাওয়া।

এসকল মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য, যাতে রোযা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

০ গোফে ও দাড়িতে তেল মাখা এবং সুরমা লাগানো মাকরূহ নয়। ঠাণ্ডার জন্য গোসল করা বা ভেজা কাপড় পেঁচিয়ে রাখা মাকরূহ নয়। অযু ছাড়া কুলি ও গরগরা করা মাকরূহ নয়, তবে সাবধান থাকতে হবে, যাতে পানি হলকের ভিতরে চলে না যায় এবং রোযা নষ্ট না হয়ে যায়।

০ দিনের শেষ দিকে মেসওয়াক করা মাকরূহ নয়, বরং দিনের প্রথম দিকের মত শেষ দিকেও মেসওয়াক করা সুন্নাত।

রোযাদারের জন্য যা মুস্তাহাব

০ সেহরী খাওয়া এবং বিলম্বে সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব, তবে ফজর উদিত হওয়ার অল্প আগেই পানাহার থেকে বিরত হওয়া উচিত, যাতে রোযার বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি না হয়।

০ সূর্য অস্ত যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তাড়াতাড়ি ইফতার করা মুস্তাহাব।

০ মিথ্যা, গীবত, কোটনামি, গালিগালাজ, অশ্লীল কথা এবং তুচ্ছ কারণে ক্রুদ্ধ হওয়া থেকে রোযাকে রক্ষা করা মুস্তাহাব। রামাযানের সদ্ব্যবহার করে বেশী বেশী তেলাওয়াত করা এবং যিকির আযকার করা মুস্তাহাব।

রোযা ভঙ্গ করার ওযরসমূহ

ইসলাম হলো স্বভাবধর্ম। তাই ইসলাম মানুষকে সাধ্যের অতিরিক্ত কোন আদেশ করে নি, বরং ওযরের কারণে রোযা স্থগিত রাখার অনুমতি দিয়েছে।

০ অসুস্থতা, সফর, গর্ভ, শিশুকে স্তন্যদান ইত্যাদি হলো রাযা না রাখার শারীআতসম্মত ওযর। সুতরাং যদি রোযার কারণে অসুস্থ ব্যক্তির শারীরিক ক্ষতি হয় বা অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার বা দীর্ঘ হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে রোযা স্থগিত রাখা জায়েয।

শারীআতসম্মত মুসাফিরও রোযা স্থগিত রাখতে পারে।

০ যদি এমন প্রচণ্ড ক্ষুধা বা পিপাসা হয় যে, রোযা ভঙ্গ না করলে অসুস্থ হয়ে পড়ার প্রবল ধারণা হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয।

রোযার কারণে গর্ভবতীর বা গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতির আশংকা হলে রোযা স্থগিত রাখা বা ভঙ্গ করা জায়েয। বুকের দুধ শুকিয়ে সন্তানের ক্ষতির আশংকা হলেও একই হুকুম।

রোযা রাখতে সক্ষম নয় এমন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তির রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। পরে সে রোযার কাযা করবে না, বরং ফিদয়া দেবে।

০ ওযর ছাড়াও নফল রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে, তবে অন্য সময় তা কাযা করা ওয়াজিব। জিহাদের প্রয়োজনে রোযা স্থগিত রাখার এবং পরে কাযা করার অনুমতি রয়েছে।

কয়েকটি মাসআলা

১ – খাদ্যদ্রব্য কেনার সময় প্রতারণার আশংকা হলে চেখে বা চিবিয়ে দেখা মাকরূহ নয়।

২ – স্বামী বা মনিব বদ মেজাজী হলে খাবার চেখে দেখা মাকরূহ নয়।

৩ – যদি খাবার চিবিয়ে দেয়ার মত কেউ না থাকে এবং চাবানোর প্রয়োজন নেই এমন খাবার না থাকে তাহলে মা তার বাচ্চার খাবার চিবিয়ে দিতে পারে।

৪ – রোযা অবস্থায় পেস্ট বা মাজন ব্যবহার করা মাকরূহ। কেননা পেস্ট ও মাজনমিশ্রিত থুথু হলকের ভিতরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫ – রামাযানের পর যত দ্রুত সম্ভব কাযা রোযা আদায় করে ফেলা উত্তম, তবে বিলম্ব করারও অবকাশ রয়েছে। আর কয়েকটি রোযা কাযা হলে লাগাতার রাখা এবং ভেঙ্গে ভেঙ্গে রাখা দু'টোরই অনুমতি রয়েছে।

৬ – কাযা আদায় করার আগেই যদি দ্বিতীয় রামাযান এসে যায় তাহলে আগে বর্তমান রামাযানের রোযা আদায় করবে, তারপর বিগত রামাযানের কাযা আদায় করবে।

৭ – প্রতিটি রোযার ফিদয়া হলো, একজন গরীবকে দু'বেলা ভরপেট

আহার করানো। ফিদয়া আদায়কারী সাধারণত যে খাবার খায় তার মধ্যম মানের খাবার হলো গ্রহণযোগ্য।

আর যদি আহার করানোর পরিবর্তে খাদ্য বা তার মূল্য দিতে চায় তাহলে অর্ধ-ছা' গম বা একছা' জব বা খেজুর অথবা তার মূল্য প্রদান করতে হবে।

প্রশ্নমালা

১ – রোযা অবস্থায় কী কী কাজ মাকরূহ, বলো।

২ – চোখে সুরমা বা ঔষধ ব্যবহার করার হুকুম কী?

৩ – রোযাদারের মেসওয়াক এবং পেস্ট ব্যবহার করার হুকুম বলো।

৪ – আরামদায়ক সফরে রোযা না রাখার, কিংবা রেখে ভেঙ্গে ফেলার হুকুম বলো।

৫ – স্ত্রীলোক কখন রোযা স্থগিত রাখতে পারবে?

৬ – রোযার পরিবর্তে ফিদয়ার হুকুম কার জন্য? এবং ফিদয়া কী?

ই'তিকাফের আহকাম

اعتكاف মানে অবস্থান করা। শারী'আতের পরিভাষায় اعتكاف অর্থ কোন পাঞ্জেগানা মসজিদে আল্লাহর ইবাদতের নিয়তে অবস্থান করা। ই'তিকাফকারীকে مُعتَكِف বলে।[১]

০ ই'তিকাফ তিন প্রকার– ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ (কিফায়াহ) এবং মুস্তাহাব।

০ কেউ যদি নযর বা মান্নাত করে যে, সে আল্লাহর ওয়াস্তে ই'তিকাফ করবে তাহলে সেটা হলো ওয়াজিব ই'তিকাফ।

০ রামাযানের শেষ দশকের ই'তিকাফ হলো সুন্নাতে মুআক্কাদাহ কিফায়াহ। অর্থাৎ মহল্লার অন্তত একজন যদি ই'তিকাফ করে তাহলে

---

১. الاعتكاف هو اللُّبْثُ في مَسجِد الجماعَةِ بِنيَّة القُرْبَةِ، و هو سنةٌ مؤكَّدة في العَشْرِ الأَخيرِ من رمَضانَ ·

সকলেই দায়মুক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু কেউ যদি ই'তিকাফ না করে তাহলে সকলেই সুন্নাতে মুআক্কাদাহ তরকের গোনাহগার হবে।

এছাড়া যে কোন সময় ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করলে সেটা হবে মুস্তাহাব ই'তিকাফ।

ইতিকাফের ফযীলত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنِ اعْتَكَفَ يومًا ابْتِغَاءَ وجهِ الله جَعَلَ اللّٰه بينَه و بينَ النار ثلاثَ خَنادِقَ أَبْعَدَ مِمَّا بينَ الخافِقَيْنِ

যে ব্যক্তি আল্লাহকে খুশী করার জন্য একদিন ই'তিকাফ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার ও জাহান্নামের মাঝে তিনটি খন্দকের আড়াল করে দেন, যার দূরত্ব আসমান-যমীনের দূরত্ব থেকেও বেশী। (তাবারানী)

ই'তিকাফের সময়

○ ওয়াজিব ই'তিকাফের সময় ততটুকুই যা বান্দা নযর করার সময় নির্ধারণ করবে। সুন্নাত ই'তিকাফের সময় হলো রামাযানের শেষ দশক। (নয় দিন বা দশ দিন।)

○ নফল বা মুস্তাহাব ই'তিকাফের নির্ধারিত কোন সময় নেই। বান্দা ই'তিকাফের নিয়তে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবে ততক্ষণই সে ই'তিকাফের ছাওয়াব পেতে থাকবে।

○ যে মসজিদে নিযুক্ত ইমাম ও মুআযযিন রয়েছে এবং যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আত হয় সেই মসজিদেই শুধু ই'তিকাফ করা যায়।

○ স্ত্রীলোকেরা বাড়ীতে ই'তিকাফ করবে। নামাযের জন্য তারা যে স্থানটি নির্দিষ্ট করবে সেটাই হলো তাদের ই'তিকাফের জায়গা। (তারা ইতিকাফের কামরায় হাঁটা-চলা করতে পারবে।)

○ ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য রোযা হলো শর্ত। সুন্নাত ও মুস্তাহাব ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত নয়।

○ বিনা ওযরে মসজিদ থেকে বের হলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যায়।[১]

---

১. و لا يخْرُجِ المعتَكِفُ من المسجد إلا لِحَاجَةِ الإنسان أو لحاجَةِ الجُمُعَةِ

○ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে[১] মসজিদ থেকে বের হওয়া যায়, তবে শর্ত এই যে, প্রয়োজন শেষ হওয়ামাত্র মসজিদে ফিরে আসবে এবং পথে অন্য কোন কাজ করবে না।

○ ই'তিকাফের মসজিদে জুমু'আ না হলে জুমু'আর প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়া যায়।

○ জানের বা মালের উপর বিপদের আশংকা দেখা দিলে মসজিদ থেকে বের হওয়া যায়। তদ্রূপ যদি মসজিদ ভেঙ্গে যায় বা অবস্থানের অনুপযোগী হয়ে পড়ে তাহলেও মসজিদ থেকে বের হওয়া যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে ই'তিকাফের নিয়তে অন্য মসজিদে চলে যেতে হবে।

আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে সামান্য সময়ের জন্য বের হলেও ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা এটা ইতিকাফের পরিপন্থী কাজ।

ছাহাবায়েন (রহঃ) বলেন, দিনের অধিকাংশ সময় বাইরে না থাকলে ইতিকাফ নষ্ট হবে না, কেননা সামান্য সময়ের ছাড় না দেয়া বান্দার জন্য কষ্টকর। (তবে তাতে ইতিকাফের রূহ বা প্রাণ অবশ্যই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।)

কয়েকটি মাসআলা

১ – মু'তাকিফ মসজিদের আদব রক্ষা করে মসজিদেই পানাহার করতে পারে।

২ – গোসল ছাড়া অসুস্থ বোধ করলে গোসলের জন্যও নিকটতম স্থানে যাওয়া যাবে।

৩ – অযুর প্রয়োজনে মসজিদের অযুখানায় যাওয়া যাবে।

৪ – ই'তিকাফের অবস্থায় মসজিদে বসে নিজের প্রয়োজনে বেচা-কেনা করা যাবে, তবে বেচা-কেনার সময় দ্রব্যটি মসজিদে হাযির করা যাবে না, কিন্তু ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বেচা-কেনা করা মাকরূহ।

---

১. অর্থাৎ পেশাব-পায়খানার প্রয়োজনে।

৫ – ই'বাদত মনে করে নীরবতা অবলম্বন করা মাকরূহ. তবে বেহুদা কথা থেকে বেঁচে থাকার জন্য নীরব থাকা মাকরূহ নয়।

৬ – যিকির ও তিলাওয়াত করা এবং দ্বীনী কথা বলা এবং দ্বীনী কিতাব পড়া এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ পড়ায় মশগুল থাকা উত্তম।

৭ – ই'তিকাফের সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদুল হারাম, তারপর মসজিদে নববী, তারপর মসজিদুল আকছা, তারপর জামে মসজিদ।

প্রশ্নমালা

১ – اعتكاف কাকে বলে এবং তা কত প্রকার?

২ – ই'তিকাফের সময় কতটুকু?

৩ – স্ত্রীলোক কোথায় ই'তিকাফ করবে?

৪ – একজন লোক তিনদিন ই'তিকাফের নযর করলো এবং সকাল-দুপুর ও রাত্রে মসজিদেই পানাহার করলো, এতে কী তার ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে?

৫ – মু'তাকিফ কী কী কারণে মসজিদ থেকে বের হতে পারে?

৬ – ই'তিকাফের ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীছ বলো।

৭ – ই'তিকাফের অবস্থায় তোমার কাগজ-কলম কেনা প্রয়োজন, অথচ তোমার কাছে পয়সা নেই, তাই তুমি তোমার রুমালটি বিক্রি করতে চাও, এখন তুমি কী করবে?

হজ্জ অধ্যায়

হজ্জ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَ لِلّٰه على الناس حِجُّ البيتِ مَنِ استَطاعَ إليه سَبيلا، و مَن كفَرَ فإنّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عن العٰلَمِين (ال عمران ٩٧)

যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে উপস্থিত হতে সক্ষম, তার উপর হজ্জ করা ফরয। আর যে তা অস্বীকার করে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ বিশ্ব-জগতের মুখাপেক্ষী নন। (আলে ইমরান–৯৭)

হাদীছ শরীফে হজ্জের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ حَجَّ لله فَلَمْ يرفُثْ و لم يفسُقْ رجَعَ كيومِ ولَدَتْه أمُّه

যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে হজ্জ করবে এবং অশ্লীলতা ও অনাচার থেকে বিরত থাকবে সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে যে দিন তার আম্মা তাকে প্রসব করেছিলো। (বোখারী, মুসলিম)

حج এর আভিধানিক অর্থ কোন পবিত্র স্থানে গমন। শারী'আতের পরিভাষায় حج অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট উপায়ে নির্দিষ্ট স্থানে গমন।[১]

হজ্জ-এর ফরযিয়ত সম্পর্কে উম্মতের ইজমা রয়েছে। এ বিষয়ে কোন মুসলমানেরই দ্বিমত নেই।

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত

নীচের শর্তগুলো পাওয়া গেলে প্রত্যেক নারী-পুরুষের উপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরযে আইন হবে।

---

١. الحَجُّ في اللغةِ القَصْدُ إلى مكانٍ مُقَدَّسٍ، و الحجُّ في الشريعةِ زيارةُ أمْكِنَةٍ مَخْصوصَةٍ في وقتٍ مَخْصوصٍ على وَجْهٍ مخصوصٍ، و قد أجمعَتِ الأمةُ على فَرضِيَّةِ الحَجِّ و لم يختَلِفْ في فرضِيَّتِه أحدٌ من المسلمين ·

১. মুসলমান হওয়া, ২. বালেগ হওয়া, ৩. সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া, ৪. স্বাধীন হওয়া, সামর্থ্যবান হওয়া। (অর্থাৎ পরিবার পরিজনের জন্য তার অনুপস্থিতকালের ভরণ-পোষণের পর প্রয়োজনীয় রাহাখরচের মালিক হওয়া।)

তবে হজ্জ আদায় করা ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হলো–

১. শারীরিক সুস্থতা ও সামর্থ্য। (সুতরাং অতিবার্ধক্য বা রোগব্যাধি ও পঙ্গুত্বের কারণে সফরে সক্ষম না হলে হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব নয়।)

২. সফরের প্রতিবন্ধকতা না থাকা এবং পথের নিরাপত্তা থাকা। (সুতরাং যুদ্ধের কারণে বা দুষ্কৃতিকারীদের কারণে বা কোন প্রাকৃতিক কারণে পথ নিরাপদ না হলে হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হবে না।)

তদ্রূপ যদি সে আটকাবস্থায় থাকে বা সরকারের পক্ষ হতে বাধার সম্মুখীন হয় তাহলেও হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

৩. সফরের দূরত্ব হলে স্ত্রীলোকের উপর হজ্জ আদায় করা ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হলো স্বামী বা কোন মাহরাম সঙ্গে থাকা। যুবতী ও বৃদ্ধা উভয়ের জন্য একই হুকুম।

৪. স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ইদ্দত থেকে ফারেগ হওয়া। (সুতরাং তালাক বা বৈধব্যের ইদ্দতে থাকা অবস্থায় হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হবে না।)

কয়েকটি মাসআলাহ

১ – হিজরতের নবম বছরের শেষ দিকে হজ্জ ফরয হয়েছে। হজ্জ যে সারা জীবনে একবার শুধু ফরয তার প্রমাণ এই যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

يا أيها النّاسُ قد فُرِضَ عليكم الحجُّ فَحُجُّوا .

তখন এক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন–

أَ كُلَّ عامٍ يا رسولَ اللّٰهِ ؟

---

১. الحجُّ فَرِيضَةُ العُمُرِ، يَجب على كلِّ مسلمٍ حُرٍّ عاقلٍ بالغٍ صَحيحٍ قادرٍ على الزّادِ و الراحِلَةِ فاضِلاً عن حَوائِجِه الأَصْلِيَّةِ و عَنْ نَفَقَةِ عِيالِه إلى حِيْنِ عَوْدِه، بِشَرْطِ أن يكونَ الطريقُ آمِنًا .

এ প্রশ্নের উত্তরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন, আর ছাহাবী পরপর তিনবার একই প্রশ্ন করলেন। তখন তিনি বললেন–

لو قلتُ نعم لَوَجَبَتْ وَ لَمَا اسْتَطَعْتُمْ

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন–

الحجُّ مَرَّةً واحدةً فَمَنْ زادَ فَتَطَوّع (مسلم)

২ – কুফুরের অবস্থায় হজ্জ করলে তা গ্রহণযোগ্য নয়, বরং মুসলমান হওয়ার পর সক্ষমতা পাওয়া গেলে হজ্জ ফরয হবে। এমনকি কোন মুসলমান যদি হজ্জ করার পর আল্লাহ্ না করুন মুরতাদ হয়ে যায়, তারপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে এবং সক্ষমতা লাভ করে তাহলে নতুন করে তার উপর হজ্জ ফরয হবে।

৩ – বালেগ হওয়ার শর্ত হলো ফরয হজ্জ আদায়ের জন্য, সুতরাং না-বালেগ বাচ্চা নফল হজ্জ করতে পারে।

৪ – সক্ষমতা এবং পথের নিরাপত্তা না থাকার কারণে যার উপর হজ্জ ফরয হয় নি সে যদি কষ্ট করে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফরযের নিয়তে হজ্জ করে ফেলে তাহলে তা ফরয হিসাবেই আদায় হবে। অর্থাৎ পরে সক্ষমতা পাওয়া গেলে নতুন করে হজ্জ ফরয হবে না।

৫ – যদি সুস্থ অবস্থায় হজ্জ ফরয হয় আর হজ্জ না করে এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তার যিম্মায় হজ্জ থেকে যাবে, সুতরাং বদল হজ্জ করানো তার উপর ওয়াজিব হবে।

৬ – স্ত্রী যদি মাহরাম পেয়ে যায় তাহলে স্বামীর অধিকার নেই স্ত্রীকে ফরয হজ্জ থেকে বাধা দেয়ার।

৭ – স্ত্রীলোক যদি মাহরাম ছাড়া হজ্জ করে তাহলে ফরয আদায় হয়ে যাবে, তবে গোনাহগার হবে।[১]

---

১. لا تَحُجُّ المرأةُ مِن مَسافَةِ السفَر إلا بِزَوْجٍ أو مَحْرَمٍ، و إذا فعلَتْ جازَ معَ الإثمِ، و نَفقَتُه عَليها .

প্রশ্নমালা

১ – হজ্জ এর পরিচয় বলো।

২ – হজ্জ জীবনে একবারমাত্র ফরয, বারবার নয়– এর প্রমাণ কী?

৩ – হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত কী কী এবং হজ্জ আদায় করা ফরয হওয়ার জন্য শর্ত কী কী?

৪ – একজন লোক মুসলমান, স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক এবং আর্থিক সক্ষমতার অধিকারী, তবু তার উপর হজ্জ ফরয হয় নি, কেন ?

৫ – ফরয হজ্জ আদায় করার পর মুরতাদ হলে তার কী হুকুম?

৬ – স্ত্রীলোকের হজ্জ সম্পর্কে যা জানো বলো।

৭ – প্রাপ্তবয়স্কতা কোন্ হজ্জের জন্য শর্ত?

৮ – না-বালেগ কিংবা গরীব যদি ফরযের নিয়তে হজ্জ করে তাহলে বালেগ হওয়ার পর এবং সচ্ছলতার পর তাদের কী হুকুম ?

৯ – হজ্জ ফরয হওয়ার যাবতীয় শর্ত পাওয়া গেছে, শুধু সরকারের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না, এ অবস্থায় তার করণীয় কী?

১০– ফরয হজ্জের ক্ষেত্রে মাহরাম পাওয়ার পর স্বামী বললো, তুমি যদি আমাকে ছাড়া হজ্জ করতে যাও তাহলে তুমি তিন তালাক, এ অবস্থায় কি স্ত্রীর উপর হজ্জ আদায় করা ফরয হবে?

হজ্জের বিশুদ্ধতার শর্তসমূহ

হজ্জের আদায় ছহী হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত।

০ প্রথম শর্ত হলো ইহরাম। আর ইহরাম অর্থ হজ্জের নিয়ত করে তালবিয়া পড়া। নামায যেমন নিয়ত ও তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া শুরু হয় না, তেমনি নিয়ত ও তালবিয়া ছাড়া হজ্জ শুরু হয় না। তালবিয়া এই–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لا شَرِيكَ لك لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ و النِّعْمَةَ لك

و المُلْكَ، لا شَرِيك لك

০ নিয়ত ছাড়া তালবিয়া এবং তালবিয়া ছাড়া নিয়ত গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য তালবিয়ার পরিবর্তে তাসবীহ, তাহলীল বা তাহমীদ যথেষ্ট হবে।

০ ইহরামের অবস্থায় পুরুষদের সেলাই করা কাপড় পড়া জায়েয নয়, বরং সেলাই ছাড়া কাপড় পরা জরুরী। আর মুস্তাহাব হলো একটি তহবন্দ ও একটি চাদর পরা।

০ দ্বিতীয় শর্ত হলো নির্দিষ্ট সময়, অর্থাৎ শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জের প্রথম দশদিন। এটাকে বলে হজ্জের মাস। সুতরাং হজ্জের মাসের আগে হজ্জের কোন আমল আদায় করলে তা ছহী হবে না। আর হজ্জের মাসের আগে ইহরাম বাঁধা ছহী হলেও তা মাকরূহ হবে।

০ তৃতীয় শর্ত হলো নির্ধারিত স্থান। অর্থাৎ ওকূফের জন্য আরাফার ময়দান এবং তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য মসজিদুল হারাম।

মীকাতের পরিচয়

০ বাইতুল্লাহর তা'যীমের জন্য নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর চারদিকে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, এগুলোকে মীকাত বলে।

০ মীকাতের বাইরে যারা বাস করে তাদেরকে 'আফাকী' বলে।

মীকাতের ভিতরে এবং হারামের সীমানার বাইরে যারা বাস করে তাদেরকে মীকাতী বলে।

মক্কার, বা হারাম এলাকার স্থায়ী বা অস্থায়ী বাসিন্দা যারা তাদেরকে মক্কী বলে।

০ আফাকী যদি হজ্জের জন্য বা অন্য কোন কারণে মক্কায় প্রবেশ করতে চায় তাহলে ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা তার জন্য হারাম।[১]

০ ইয়ামানী ও ভারতবর্ষীয়দের মীকাত হলো ইয়ালামলাম।

মিসর, সিরিয়া ও মরক্কোর অধিবাসীদের মীকাত হলো জোহফা।

---

১. لا يَجوز لِلْآفاقِيِّ أن يَتَجاوَزَ المِيقاتَ بِدُونِ إِحْرامٍ إذا أرادَ أن يدخُلَ مكّةَ

ইরাকীদের এবং সমস্ত পূর্বদেশীয়দের মীকাত হলো যাতু ইরক।

মদীনাবাসীদের মীকাত হলো যুলহোলায়ফা।

নাজদের অধিবাসীদের মীকাত হলো ক্বারন।

তবে যে কোন দেশের আফাকী যে কোন মীকাতই অতিক্রম করুক, তাকে ইহরাম গ্রহণ করতে হবে।

০ মক্কার অধিবাসী কিংবা মক্কায় অবস্থানকারীদের জন্য হজ্জের মীকাত হলো হারামের এলাকা, আর ওমরার মীকাত হলো হারামের সীমানার বাইরের এলাকা, যেটাকে 'হিল্ল' বলে।

০ মীকাতীর জন্য হজ্জ ও ওমরা উভয়ের মীকাত হলো 'হিল্ল'। অর্থাৎ সে হারামের সীমানার বাইরে মীকাতের ভিতরের যে কোন স্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে পারে।

কয়েকটি মাসআলা

১ – আফাকী যদি মক্কায় প্রবেশের ইচ্ছা না করে, বরং শুধু মীকাতের ভিতরে যাওয়ার নিয়ত করে তাহলে সে ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করতে পারে।

২ – মীকাতী হজ্জ বা ওমরা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করতে চাইলে ইহরাম ছাড়া প্রবেশ করতে পারে।

৩ – আফাকী যদি মক্কার উদ্দেশ্যে ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করে তাহলে তাকে দম দিতে হবে। অবশ্য যদি সে ফিরে এসে মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে নেয় তাহলে দম মাফ হয়ে যাবে।

প্রশ্নমালা

১ – মীকাত, মীকাতী ও আফাকী-এর পরিচয় বলো।

২ – আফাকী কখন ইহরাম ছাড়া মীকাত পার হতে পারে এবং পারে না, বলো।

৪ – পঞ্চ মীকাতের নাম বলো।

৫ – আফাকী হজ্জ বা ওমরার জন্য নয়, বরং ব্যবসার জন্য মক্কায় প্রবেশ করতে চায়, তাহলে কি তাকে ইহরাম বাঁধতে হবে?

৬ – মীকাতী শুধু ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করতে চায়, তাহলে কি তাকে ইহরাম গ্রহণ করতে হবে?

৭ – যারা মক্কার বাসিন্দা বা মক্কায় অবস্থান করে তাদের ইহরামের মীকাত কোনটি?

৮ – আফাকী ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করলে তার কী হুকুম?

হজ্জের রোকন

হজ্জের রোকন দু'টি–

প্রথম রোকন হলো আরাফার ময়দানে ওকূফ বা অবস্থান করা। ওকূফের সময় হলো যিলহজ্জের নবম দিনের যাওয়াল থেকে দশ তারিখের ফজর পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে এক মুহূর্তকাল অবস্থান করলেও ওকূফের ফরযিয়ত আদায় হয়ে যায়।[১]

দ্বিতীয় রোকন হলো ওকূফে আরাফার পরে বাইতুল্লাহর সাত চক্কর তাওয়াফ। এটাকে তাওয়াফে যিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাযাহ বলে।

এদু'টি হচ্ছে হজ্জের রোকন, আর ইহরাম হচ্ছে হজ্জের শর্ত।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

হজ্জের ওয়াজিব আমল হচ্ছে–

১ – মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

২ – সামান্য সময় হলেও মুযদালিফায় ওকূফ করা, আর তার সময় হলো দশ তারিখের ফজর থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত।

৩ – কোরবানীর তিন দিনের ভিতরে তাওয়াফে যিয়ারত করা।

৪ – ছাফা ও মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর সাঈ করা এবং ছাফা থেকে শুরু করে মারওয়ায় শেষ করা।

---

১. مَن فاتَه الوُقوف بِعَرفَةَ فقد فاتَه الحَجُّ، و وَقْتُ الوُقوفِ مِنْ زَوالِ الشمسِ إلى طُلوعِ الفَجْرِ الثاني مِنَ الغَدِ.

৫ – গায়র মক্কী যারা তাদের জন্য বিদায় তাওয়াফ করা। এটাকে তাওয়াফুছ-ছাদার বলে।

৬ – প্রত্যেক তাওয়াফের পরে দু'রাক'আত নামায পড়া।

৭ – কোরবানীর দিনগুলোতে তিন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা (দশ তারিখে শুধু জামরাতুল 'আকাবায়)।

৮ – তাহারাতের অবস্থায় তাওয়াফ ও সাঈ করা।

৯ – হারামের ভিতরে এবং কোরবানীর দিনগুলোর মধ্যে মাথা কামানো বা পরিমাণমত চুল ছাটা।

১০ – ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকা, যেমন– সেলাই করা কাপড় পরা, মাথা বা চেহারা ঢেকে রাখা এবং হারামের পশু শিকার করা

হজ্জের সুন্নাতসমূহ

হজ্জের সুন্নাত আমলগুলো হচ্ছে–

১ – ইহরামের সময় গোসল বা অযু করা।

২ – নতুন বা ধোয়া সাদা তহবন্দ ও চাদর পরা।

৩ – ইহরামের নিয়তের পর দু'রাক'আত নফল পড়া।

৪ – সব সময় (বিশেষত উঁচু-নীচু স্থানে আরোহণ-অবতরণের সময়) বেশী বেশী তালবিয়া পড়া।

৫ – গায়র মক্কীদের জন্য তাওয়াফুল কুদূম করা।

৬ – ইযতিবা করা। অর্থাৎ তাওয়াফ শুরু করার আগে চাদরের প্রান্তকে ডান বগলের নীচে দিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখা।

৭ – তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রামল করা। অর্থাৎ দুই কাঁধ দুলিয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপে একটু দ্রুত চলা।

৮ – সাঈর সময় দুই সবুজ চিহ্নের মাঝে একটু দৌড়ের মত হাঁটা (পুরুষদের জন্য)

৯ – (সম্ভব হলে) তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করের শেষে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা এবং চুম্বন করা।

১০ – যিলহজ্জের আট তারিখে মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া। এই দিনটিকে يَومُ التَّرْوِيَةِ বলে।

১১ – নয় তারিখে সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

১২ – কোরবানীর দিনগুলোতে মিনায় রাত্রি যাপন করা।

১৩ – মুফরিদ-এর জন্য কোরবানী করা (এবং কোরবানীর পশু সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া)

হজ্জের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ

ইহরামের অবস্থায় এসকল কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরী–[১]

১ – ঝগড়া বিবাদ, অশ্লীল কথা ও গালিগালাজ করা।

২ –শরীরে ও কাপড়ে খোশবু ব্যবহার করা।

৩ – হাত-পায়ের নখ কাটা।

৪ – পুরুষের জন্য সেলাই করা কাপড় পরা। যেমন, পা'জামা-পাঞ্জাবি জুব্বা, টুপি ও মোজা।

৫ – মাথা বা চেহারা ঢাকা (স্ত্রীলোকের[২] চেহারা ও হাত ঢাকা)

৬ – মাথার বা দাড়ির বা অন্য কোন স্থানের চুল ফেলা।

৭ – চুলে এবং শরীরে তেল লাগানো।

৮ – হারাম এলাকার গাছ বা ঘাস কাটা বা উপড়ানো।

৯ – হারাম এলাকার ভোজ্য বা অভোজ্য বন্যপশু শিকার করা।

কয়েকটি মাসআলা

১ – যে কোন গোনাহ থেকে তো সব সময় বিরত থাকা আবশ্যক, তবে ইহরামের সময় তা আরো বেশী আবশ্যক।

---

১. لا يلبَسُ المُحْرِمُ ثوبًا مَخِيطًا و لا يَتَطَيَّب و لا يُحَلِّقُ شعَرَ رأسِه و جَسَدِه، و لا يُقَلِّم أظفارَه، و لا يُغَطِّي رأسَه و لا وَجْهَه، و لا يَرْفُثُ و لا يفسُق و لا يقتل صَيْدًا و لا يُشِير إليه و لا يَدُلُّ عليه .

২. স্ত্রীলোক মাথা ঢেকে রাখবে।

২ – হারামের বন্যপশু নিজে শিকার করা যেমন নিষিদ্ধ তেমনি শিকারে সাহায্য করা বা দেখিয়ে দেয়াও নিষিদ্ধ।

৩ – কোন ওযর না থাকলে সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে তাওয়াফ ও সাঈ করা ওয়াজিব।

৪ – তালবিয়ার সময় হলো ইহরামের শুরু থেকে দশ তারিখের জামরাতুল 'আকাবায় (বড় জামরায়) প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত।

প্রশ্নমালা

১ – হজ্জের রোকন কী কী? এবং কোন্ রোকন আদায়ের সময় ও স্থান কোনটি?

২ – মুযদালিফার ওকূফ সম্পর্কে কী জানো বলো।

৩ – তাওয়াফুল বিদা কাদের জন্য ওয়াজিব এবং এই তাওয়াফের দ্বিতীয় নাম কী?

৪ – কখন ও কোথায় মাথা কামানো ওয়াজিব? এবং মাথা কামানোর বিকল্প বিধান কী?

৫ – ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো আলোচনা করো।

৬ – ইহরামের জন্য অযু করা ওয়াজিব, আর গোসল করা সুন্নাত– এই মাসআলাটি সম্পর্কে মন্তব্য করো।

৭ – يوم التروية সম্পর্কে কী জানো বলো।

৮ – মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে কখন রওয়ানা দেয়া সুন্নাত?

৯ – রামল ও ইযতিবা (اَلرَّمَلُ وَالِاضْطِبَاعُ) সম্পর্কে কী জানো বলো।

হজ্জের প্রকার

ওমরা করা না করার দিক থেকে হজ্জ তিন প্রকার–

حَجُّ الإفرادِ – حَجُّ التمتُّعِ – حج القِرَانِ

০ হজ্জুল ইফরাদ মানে শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধা এবং হজ্জের আগে

ওমরা না করে শুধু হজ্জ করে হজ্জ শেষে ইহরাম থেকে হালাল হওয়া।[১]

তামাত্তু হজ্জের অর্থ হলো হজ্জের মাসে প্রথমে শুধু ওমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করা এবং প্রথমে ওমরার তাওয়াফ করা এবং তাওয়াফের দু'রাক'আত নফলের পর ওমরার সাঈ করা, তারপর ওমরার ইহরাম থেকে হালাল হওয়া।

হালাল হওয়ার পর যিলহজ্জের আট তারিখ পর্যন্ত সে মক্কায় অবস্থান করবে এবং হালাল অবস্থার সমস্ত সুবিধা ভোগ করবে।

যিলহজ্জের আট তারিখে মক্কী হিসাবে সে মক্কা থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং হজ্জের যাবতীয় কাজ পুরা করবে।

তামাত্তু হজ্জ আদায়কারীর জন্য ওয়াজিব হলো (হলক বা চুল ছাঁটার মাধ্যমে) হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার আগে দশ তারিখে 'জামরাতুল আকাবা'র কংকর নিক্ষেপের পর বকরী কোরবানী করা। (তবে গরু বা উটের সাতভাগের একভাগও যথেষ্ট হবে।)

এই কোরবানীর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর শোকর আদায় করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে একই সফরে ওমরা ও হজ্জ দু'টোই আদায় করার তাওফীক দান করেছেন।

যদি কোরবানী করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে হজ্জের দিনগুলোতে মুহরিম অবস্থায় তিনটি রোযা রাখবে এবং হজ্জের ইহরাম থেকে ফারিগ হয়ে আইয়ামে তাশরীকের পর যে কোন সময় সাতটি রোযা রাখবে।

ক্বিরান হজ্জ অর্থ হলো – মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধার সময় একত্রে ওমরা ও হজ্জের নিয়ত করা। সুতরাং ইহরামের দু'রাক'আত সুন্নাত আদায়ের পর সে এভাবে নিয়ত করবে–

اللهم إِنِّي أُرِيد العُمْرَةَ وَ الحجَّ فَيَسِّرْهما لي و تَقَبَّلْهما مني

তারপর তালবিয়া পড়বে। এভাবে সে যখন মক্কায় প্রবেশ করবে তখন

---

١. حَجُّ الإفراد، أن يُحْرِمَ بالحجِّ فَقَطْ و لا يَعْتَمِرَ قَبْلَه و حجُّ التمَتُّعِ أن يُحرِمَ بالعُمرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ و يطوفَ و يَسْعٰى و يُحِلَّ مِنَ الإحرامِ، ثم يُحرِمَ بالحجِّ يومَ التروِيَةِ و يأتِيَ بِأَفْعالِ الحج، و حَجُّ القِرانِ أن يُحرِمَ بالعمرة و الحجِّ مَعًا .

প্রথমে রামলসহ তাওয়াফ করবে এবং তাওয়াফের দু'রাক'আত আদায়ের পর সাঈ করবে।

এভাবে ওমরার আমল শেষ করার পর ইহ্‌রাম থেকে হালাল না হয়ে একই ইহ্‌রামে হজ্জের আমল শুরু করবে। অর্থাৎ প্রথমে তাওয়াফুল কুদূম করবে। তারপর পর্যায়ক্রমে হজ্জের আমল করে যাবে।

দশ তারিখে 'জামরাতুল আকাবা'র কংকর নিক্ষেপের পর একটি বকরী কোরবানী করা ওয়াজিব হবে। (একটি বাদানার[১] সাতভাগের একভাগও হতে পারে।)

যদি কোরবানী করার সামর্থ্য না থাকে তাহলে দশতারিখের আগে হজ্জের মাসে তিনটি রোযা রাখবে, আর হজ্জ থেকে ফারেগ হয়ে আইয়ামে তাশরীকের পর সাতটি রোযা রাখবে, মক্কায়, কিংবা বাড়ীতে এসে।

দশ তরিখের আগে তিন রোযা না রাখলে কোরবানী ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

কয়েকটি মাসআলা

১ – ক্বিরান তামাত্তু থেকে উত্তম, আর তামাত্তু ইফরাদ থেকে উত্তম।

২ – তামাত্তুর জন্য শর্ত হলো একই সফরে ওমরা ও হজ্জ করা। যদি ওমরা করার পর দেশে ফিরে আসে, তারপর গিয়ে হজ্জ করে, তাহলে সেটা তামাত্তু হজ্জ হবে না।

৩ – তামাত্তু বা ক্বিরান শুধু আফাকীদের জন্য, মীকাতী বা মক্কীদের জন্য হলো হজ্জুল ইফরাদ। কেননা তারা তো হজ্জের পরেও ওমরা করার সুযোগ পাবে।

প্রশ্নমালা

১ – হজ্জ কত প্রকার ও কী কী এবং কোনটির মর্যাদা কী?

২ – তামাত্তু হজ্জের ছূরত কী?

---

১. بَدَنَةٌ উট বা গরু বা মোষ।

৩ – তামাত্তু ও কি্বরানের মাঝে পার্থক্য কী?

৪ – তোমার আব্বা মক্কা শরীফে চাকুরী করেন, এখন তিনি যদি হজ্জ করতে চান তাহ্‌লে কোন্ প্রকার হজ্জ করবেন?

৫ – কোন্ হজ্জে কোরবানী করা ওয়াজিব এবং কোরবানীর সামার্থ্য না থাকলে কী করণীয়?

৬ – কি্বরান বা তামাত্তুকারী দশ তারিখের আগের তিনটি রোযা না রাখলে কী করণীয়?

৭ – কি্বরান বা তামাত্তুকারী হজ্জ শেষ করে ১২ তারিখ থেকে শুরু করে সাতটি রোযা রাখলে তার কি হুকুম?

ইফরাদ হজ্জের বিবরণ

তুমি যদি হজ্জ করতে চাও তাহ্‌লে হজ্জের মাসে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দাও। যখন তুমি মীকাতে পৌঁছবে, বা মীকাতের বরাবর কোন স্থানে পৌঁছবে তখন গোসল বা অযু করে নাও।

তারপর সেলাই করা পোশাক খুলে ইহ্‌রামের কাপড় (সাদা নতুন বা ধোয়া তহবন্দ ও চাদর) পরে নাও। তারপর দু'রাক'আত নামায পড়ে (মনে মনে) হজ্জের নিয়ত করো। তবে মনের নিয়তের সঙ্গে মুখের নিয়তও উত্তম। নিয়ত এই –

اللهم إني أريد الحجَّ فَيَسِّرْه لي و تَقَبَّلْه مني

তারপর তালবিয়া পড়ো। নিয়ত করা এবং তালবিয়া পড়া দ্বারা ইহ্‌রাম হয়ে গেলো।[১] এখন থেকে ইহ্‌রামের যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করা অবশ্যকর্তব্য।

ইহ্‌রামের পর থেকে বেশী বেশী তালবিয়া পড়ো। বিশেষত নামাযের পরে, উঁচু স্থানে আরোহণকালে, নীচু স্থানে অবতরণকালে, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময় এবং কোন কাফেলা বা সওয়ারীকে দেখার সময়।

---

١. الإحرامُ هو التَّلبيَةُ مع النيَّة، فَإذا أرادَ الإحرامَ اغتَسَل أو تَوضَّأ و لبِسَ ثَوْبَيْنِ جَديدين أو غَسيلَين و صَلَّى ركعَتَيْنِ و قال : اللهم إني أريد الحجَّ فيسِّرْه لي و تقبَّله منى، ثم يُلَبِّي عَقِيبَ صَلاتِه، فإذا لَبَّى فقد أحرَمَ ·

মক্কা শরীফে প্রবেশ করে (সামানপত্র রেখে) মসজিদুল হারামে যাও। যখন বাইতুল্লাহ্ নযরে পড়বে তখন তাযীমের জন্য 'আল্লাহু আকবার' ও লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলো। এটাকে তাকবীর ও তাহলীল বলে।

তারপর হাজারে আসওয়াদের বরাবরে দাঁড়াও এবং তাকবীর ও তাহলীল বলো। কাউকে কষ্ট না দিয়ে সম্ভব হলে হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করো।[১]

চুম্বনের নিয়ম হলো দুই হাত ফাঁক করে হাজারে আসওয়াদের উপর রেখে মাঝখানে মুখ রেখে বিনা আওয়াজে চুম্বন করা।

চুম্বন করা সম্ভব না হলে দূর থেকে হাজারে আসওয়াদের দিকে দু' হাতের তালু দ্বারা ইশারা করে হাতে চুম্বন করো।

তারপর হাজারে আসওয়াদের ডান দিক থেকে তাওয়াফ শুরু করো। যখন তুমি হাজারে আসওয়াদের বরাবর এসে পৌঁছবে তখন এক চক্কর হবে। এভাবে সাত চক্করে তাওয়াফ পূর্ণ হবে।

প্রথম তিন চক্করে রামল করো, বাকী চার চক্করে পূর্ণ প্রশান্তির সঙ্গে এবং ভাবগম্ভীরভাবে হেঁটে যাও। আর প্রতিবার হাজারে আসওয়াদ অতিক্রম করার সময় সহজে সম্ভব হলে চুম্বন করো এবং সপ্তম চক্করের সময় চুম্বনের মাধ্যমে তাওয়াফ শেষ করো। (সহজে চুম্বন করা সম্ভব না হলে দু'হাতের তালু দ্বারা ইশারা করে হাতে চুম্বন করো।)

তারপর সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীমীর কাছাকাছি দু'রাক'আত নফল পড়ো। আর সম্ভব না হলে মসজিদুল হারামের যে কোন স্থানে পড়তে পারো।

এটাকে তাওয়াফুল কুদূম বলে এবং এটা হলো সুন্নাত তাওয়াফ।

তাওয়াফের পর ছাফা পাহাড়ে আরোহণ করো এবং কিবলমুখী দাঁড়িয়ে তাকবীর ও তাহলীল বলো এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে দুরূদ পড়ো এবং আল্লাহর কাছে দু'আ-মুনাজাত করো।

---

১. وإذا دَخَل مَكَّةَ ابتَدَأَ بالمسجِد الحرام، فَإذا عَايَنَ البيتَ كَبَّرَ و هَلَّلَ و ابتَدَأَ بِالحَجَرِ الأَسْوَدِ فَاسْتَقْبَلَه و كبَّرَ و هَلَّل و رفَعَ يدَيْهِ معَ التكبيرِ وَ اسْتَلَمَه و قَبَّلَه إن استطاعَ دُونَ أن يُؤْذِيَ مسلماً، ثم يطوفَ طوافَ القُدوم .

এবার ছাফা পাহাড় থেকে নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে যাও। মারওয়াতে আরোহণ করে একইভাবে কিবলামুখী হয়ে তাকবীর, তাহলীল, দুরূদ ও দু'আ-মুনাজাত করো।

এভাবে এক চক্কর হলো। এখন ছাফা পাহাড়ে এসো। দু'চক্কর হলো। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করো।

প্রতি চক্করে দুই সবুজ চিহ্নের মাঝখানের স্থানে কিছুটা দৌড়ের মত দ্রুত হাঁটতে হবে।

তারপর যিলহজ্জের আট তারিখে ফজরের নামায পড়ে মক্কা থেকে মিনার উদ্দেশে রওয়ানা করো এবং সেখানে দিন কাটিয়ে রাত্রি যাপন করো।

নয় তারিখ হলো يوم عرفة বা আরাফা দিবস। নয় তারিখে সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দাও এবং সেখানে ওকূফ করো। ওকূফের সময় তাকবীর, তাহলীল, দুরূদ ও দু'আ-মুনাজাতে মশগুল থাকো।

যাওয়ালের পর ইমাম যোহরের সময় এক আযান ও দুই ইকামাতে যোহর ও আছরের নামায পড়াবেন। তুমিও জামা'আতে যোহর ও আছর একসঙ্গে পড়ে নাও।[১]

সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওকূফ করে যাও। (যদিও মূল রোকন হলো মুহূর্তের ওকূফ) তারপর মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দাও এবং সেখানে রাত্রি যাপন করো। মুযদালিফায় ইমাম এক আযান ও এক ইকামাতে এশার সময় মাগরিব ও এশার নামায পড়াবেন। তুমিও জামা'আতে মাগরিব-এশা একসঙ্গে পড়ে নাও।

দশ তারিখ হলো يوم النحر বা কোরবানির দিন। দশ তারিখে যখন ফজর উদিত হবে তখন বেশ অন্ধকার থাকতেই ইমাম ফজর পড়াবেন। তুমিও ইমামের সঙ্গে জামা'আতে ফজর পড়ে নাও।

তারপর সকলে ইমামের সঙ্গে দু'আ-মুনাজাত করবে, তুমিও করো। তারপর সূর্যোদয়ের আগে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দাও এবং জামরাতুল

১. মূল জামা'আতে শরীক হতে না পারলে নিজের খিমায় আলাদা জামা'আত করো।

'আকাবায় এসে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করো। প্রথম কংকরের সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া বন্ধ করে দাও।

এরপর ইচ্ছা করলে কোরবানী করো। তারপর মাথা হলক করো বা পরিমাণ মত ছেঁটে নাও, তবে হলক করাই উত্তম।

তারপর কোরবানীর তিনদিনের যে কোন সময় মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত করো, তবে দশ তারিখে করাই উত্তম। এটা হলো হজ্জের দ্বিতীয় রোকন। তাওয়াফে যিয়ারতের পর তুমি মিনায় এসে সেখানেই অবস্থান করো।

এগার তারিখে যাওয়ালের পর তিনটি জামরায় তারতীব মত রামী করো। অর্থাৎ মসজিদুল খায়ফের নিকটবর্তী প্রথম জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করো এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলো। সাত কংকর নিক্ষেপ করে সেখানে একটু থেমে দু'আ-মুনাজাত করো।

তারপর একই নিয়মে মাঝখানের জামরায় রামী করো এবং দু'আ-মুনাজাত করো।

তারপর জামরাতুল 'আকাবায় একই নিয়মে রামী করো। তবে রামী শেষে এখানে আর থামবে না।

বার তারিখে যাওয়ালের পর একই নিয়মে রামী করো। রামীর দিনগুলোতে মিনায় রাত্রি যাপন করাই সুন্নাত।

এর পর মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দাও এবং 'মুহাচ্ছাব' নামক স্থানে একটু অবস্থান করো। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে অবস্থান করেছিলেন। তারপর মক্কায় এসে রামল ও সাঈ ছাড়া তাওয়াফ করো। এটা হলো তাওয়াফুল বিদা। এটাকে তাওয়াফুছ-ছাদারও বলে।

তাওয়াফের পর দু'রাকাত নামায পড়ে যমযম কূপের পাড়ে আসো এবং দাঁড়ানো অবস্থায় যমযমের পানি যত পারো পান করো।

তারপর মুলতাযিমে এসে মনের সাধ মিটিয়ে রোনাযারি করো এবং যত পারো আল্লাহর কাছে দু'আ-মুনাজাত করো।

এরপর যখন দেশের উদ্দেশ্যে বিদায় হবে তখন বাইতুল্লাহর বিচ্ছেদে বিষণ্ন হৃদয়ে অশ্রুসজল চোখে বিদায় নেবে।

ওমরা

عمرة এর আভিধানিক অর্থ, যিয়ারত বা সাক্ষাৎ, শারীআতের পরিভাষায়, ওমরা হলো বিশেষ আমলসহ বাইতুল্লাহর যিয়ারত করা।

হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত বলা হয়েছে সেগুলো যদি পাওয়া যায় তাহলে জীবনে একবার ওমরা করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ।

হাদীছ শরীফে ওমরার বিরাট ফযীলত এসেছে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

تَابِعُوا بينَ الحَجِّ و العُمرةِ، فإنه يَزِيدُ في العُمُرِ و الرِّزقِ و يَنْفِيان الذُّنوبَ كما يَنْفِي الكِيْرُ خُبُثَ الحَدِيدِ .

তোমরা হজ্জের পর ওমরা করো, কেননা তা হায়াত ও রিযিক বৃদ্ধি করে এবং গোনাহকে এমনভাবে পরিষ্কার করে যেমন ভাট্টি লোহার ময়লা পরিষ্কার করে। (তিরমিযি)

○ বছরের যে কোন সময় ওমরা আদায় করা যায়। তবে আরাফার দিনে, নহরের দিনে এবং আইয়ামে তাশরীকে ওমরার ইহরাম করা মাকরূহ।[১]

○ ওমরার জন্য সর্বোত্তম সময় হলো রামাযান মাস। কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানের ওমরাকে তাঁর সঙ্গে হজ্জ আদায়ের সমতুল্য বলেছেন।

ওমরার কাজ চারটি– ইহরাম করা, তাওয়াফ করা, ছাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা এবং মাথা কামানো, বা চুল ছোট করে ছাঁটা।

○ তুমি যদি মক্কার বাসিন্দা হও, বা মক্কায় মুকীম হও তাহলে ওমরার ইহরামের জন্য হারামের এলাকার বাইরে 'হিল্ল' এলাকায় যাও এবং যথা নিয়মে ইহরাম গ্রহণ করো।

---

১. العُمْرَةُ سُنَّةٌ مؤكَّدة في العُمُرِ مَرَّةً، و هي الإِحْرام و الطَّوافُ و السَّعْيُ، ثم يُحَلِّقُ أو يُقَصِّرُ، و هي جائِزَةٌ في جَميعِ السَّنَةِ و تُكْرَهُ يومَ عَرَفَةَ و يومَ النحرِ و أيامَ التشريقِ .

আর যদি মক্কায় প্রবেশ না করে থাকো তাহলে মীকাত থেকে ইহ্‌রাম গ্রহণ করে মক্কায় প্রবেশ করো এবং তাওয়াফ ও সাঈ করে নাও। তারপর মাথা কামিয়ে বা চুল ছেঁটে হালাল হয়ে যাও।

কয়েকটি মাসআলা

১ – নয় তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় ওকূফ করা ওয়াজিব। সূর্যাস্তের আগে আরাফা থেকে বের হলে দম দিতে হবে।

২ – দশ তারিখে দুপুরের আগ পর্যন্ত হলো কংকর নিক্ষেপের সুন্নাত সময়। আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত হলো মুবাহ্ সময়। আর সূর্যাস্তের পর হতে ১১ তারিখের ফজরের আগ পর্যন্ত হলো মাকরূহ সময়। তবে দুর্বল, মাযূর ও নারীদের[১] জন্য ভিড় এড়িয়ে রাত্রে কংকর নিক্ষেপের অনুমতি রয়েছে। তাদের জন্য তা মাকরূহ নয়।

৩ – ১৩ তারিখে ফজরের আগে মিনার এলাকা ত্যাগ না করলে ঐ দিনও কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব হবে।

মক্কীদের জন্য ওমরার ইহ্‌রামের সর্বোত্তম স্থান হলো তানঈমের মসজিদে 'আইশা।

প্রশ্নমালা

১ – নয় তারিখ থেকে ১০ তারিখের ফজর পর্যন্ত হজ্জের আমল বর্ণনা করো।

২ – ১০ তারিখের আমল বর্ণনা করো।

৩ – ১১ ও ১২ তারিখের আমল বর্ণনা করো।

৪ – তুমি ওমরা করতে হলে কোথেকে ইহ্‌রাম গ্রহণ করবে?

৫ – তুমি ওমরা কীভাবে আদায় করবে, বিবরণ দাও।

---

১. তাদের সঙ্গী পুরুষের ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

হজ্জের ত্রুটি ও তার প্রতিকার

جناية অর্থ এমন কোন কাজ করা যা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

হজ্জের জিনায়ত দুই প্রকার। হারামের মর্যাদা নষ্ট করার জিনায়াত এবং ইহ্রামের মর্যাদা নষ্ট করার জিনায়াত।

হারামের জিনায়াত দু'টি। ১. হারামের বন্যপশু শিকার করা এবং হত্যা করা, কিংবা নিজে শিকার না করে অন্যকে দেখিয়ে দেয়া। ২. হারামের গাছ বা ঘাস কেটে ফেলা বা উপড়ে ফেলা।

এ অপরাধ কোন মুহরিম করুক, কিংবা হালাল ব্যক্তি করুক তাকে কাফফারা দিতে হবে।

কোন মুহরিম বা হালাল ব্যক্তি যদি হারামের বন্যপশু শিকার করে এবং যবেহ করে তাহলে তা খাওয়া জায়েয হবে না, বরং তা মুরদা বলে গণ্য হবে।

কোন হালাল ব্যক্তি যদি হারামের পশু শিকার করে তাহলে তাকে ঐ পশুর মূল্য গরীবদের মাঝে ছাদাকা করতে হবে। মূল্য ছাদাকা করার পরিবর্তে রোযা রাখা জায়েয হবে না।

মুহরিম বা হালাল ব্যক্তি যদি হারামের গাছ বা ঘাস কর্তন করে তাহলে মূল্য ছাদাকা করা ওয়াজিব হবে।

ইহ্রামের জিনায়াত হলো মুহরিম অবস্থায় হজ্জের নিষিদ্ধ কোন কাজ করা, কিংবা হজ্জের কোন ওয়াজিব তরক করা।

মুহরিম যদি বিনা ওযরে–

১ – সেলাই করা কাপড় পরে

২ – মাথার বা দাড়ির চুল চার ভাগের একভাগ বা আরো বেশী দূর করে

৩ – পূর্ণ একদিন মাথা বা চেহারা ঢেকে রাখে

৪ – বড় অঙ্গগুলোর পূর্ণ এক অঙ্গে[১] যে কোন প্রকার খোশবু মাখে,

১. যেমন– উরু, পায়ের গোছা, বাহু, চেহারা, মাথা

কিংবা পূর্ণ একটি খোশবুমাখা কাপড় পরে

৫ – এক হাতের বা এক পায়ের নখ কর্তন করে

৬ – তাওয়াফে ছাদর বা বিদায় তাওয়াফ তরক করে

৭ – হাদাছ অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করে

তাহলে একটি বকরী যবেহ্ করা ওয়াজিব হবে। এটাকে বলে কাফফারার দম। (এ ক্ষেত্রে একটি বাদানাহ্-এর সাতভাগের একভাগ দেয়াও জায়েয হবে।)

এ সব কাজ যদি ওযরের কারণে করে তাহলে, হয় দম দেবে, নয়ত মিসকিনকে অর্ধ ছা' করে ছাদাকা করবে, নয়ত তিনটি রোযা রাখবে।

মুহরিম যদি

১ – মাথার বা দাড়ির চার ভাগের একভাগের কম হলক করে

২ – একটি বা দু'টি নখ কাটে

৩ – একদিনের কম সময় সেলাই করা বা খোশবুমাখা কাপড় পরে

৪ – হাদাছ অবস্থায় তাওয়াফে কুদূম বা তাওয়াফে ছাদর করে

৫ – সাতটি করে কংকর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে একটি কংকর তরক করে

৬ – একদিনের কম সময় মাথা বা চেহারা ঢেকে রাখে

তাহলে এসকল ক্ষেত্রে ছাদাকা ওয়াজিব হবে, যার পরিমাণ হলো অর্ধ ছা' গম বা তার মূল্য।

কয়েকটি মাসআলা

১ – হারামের পশু ভোজ্য হোক বা অভোজ্য উভয় ক্ষেত্রেই মূল্য ছাদাকা করতে হবে।

২ – দু'জন অভিজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি পশুটির শিকার-স্থলের বা নিকটবর্তী স্থানের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করবেন।

৩ – শিকারের মূল্য যদি একটি 'হাদী'-এর সমান হয় তাহলে মুহরিম একটি 'হাদী' কিনে হারাম এলাকায় যবেহ্ করতে পারে, কিংবা সেই মূল্যে গম কিনে প্রত্যেক ফকীরকে অর্ধ-ছা' হিসাবে

ছাদাকা করতে পারে, কিংবা প্রতি অর্ধ-ছা'-এর পরিবর্তে একটি রোযা রাখতে পারে।

হাদীর মূল্য পরিমাণ না হলে তা দ্বারা গম খরিদ করে প্রত্যেক ফকীরকে অর্ধ-ছা' ছাদাকা করতে পারে কিংবা প্রতি অর্ধ-ছা'-এর পরিবর্তে একটি করে রোযা রাখতে পারে।

৪ – হারামের কষ্টদায়ক পোকা-মাকড় হত্যা করলে কোন কাফফারা নেই। যেমন, বিচ্ছু, বোলতা, পিঁপড়া, মশা, মাছি,

সাপ, পাগলা কুকুর ও ইঁদুর মারলেও কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

৫ – কোন কোন জিনায়াত আছে যা দ্বারা হজ্জ নষ্টই হয়ে যায়, আবার কোন কোন জিনায়াত আছে যার কাফফারা হিসাবে 'বাদানাহ' যবেহ করতে হয়, বকরী যবেহ করা যথেষ্ট হয় না। এ সম্পর্কে তোমরা বড় কিতাবে জানতে পারবে।

প্রশ্নমালা

১ – হারামের মর্যাদা নষ্টকারী জিনায়াত কী কী? এবং তার কাফফারা কী, বিস্তারিত বলো।

২ – মুহরিমের কোন্ জিনায়াতে বকরী যবেহ করা ওয়াজিব?

৩ – মাথার বা দাড়ির চুল কি পরিমাণ হলক করলে কোন্ কাফফারা ওয়াজিব হয়?

৪ – চেহারা কতক্ষণ ঢেকে রাখলে কী কাফফারা ওয়াজিব হয়?

৫ – কোন্ কোন্ জিনায়াত দ্বারা অর্ধ-ছা' ছাদাকা করা ওয়াজিব হয়?

৫ – কী কী হত্যা করা দ্বারা কোন কাফফারা ওয়াজিব হয় না, বলো।

হাদী-এর বয়ান

হারামে যবেহ করার জন্য যে পশু আনা হয় সেটাকে হাদী বলে।[১]

কোরবানীর পশুর জন্য যা কিছু শর্ত হাদীর জন্যও তা তা শর্ত। সুতরাং একবছর পার হয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়া ভেড়া-বকরী বা দুম্বা হাদী

১. الهَدْيُ ما يُسَاق إلى الحَرَمِ لِيُذبَحَ على وَجْهِ القُرْبَةِ

হিসাবে যবেহ করা যাবে এর কম বয়সের হলে জায়েয হবে না।

গরুর ক্ষেত্রে তৃতীয় বছরে পা রাখা এবং উটের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ বছরে পা রাখা হলো শর্ত।

কোরবানীর পশু যে সকল দোষ থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত হাদীর পশুও সে সকল দোষ থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত।

একটি বকরী একজনের পক্ষ হতে জায়েয হবে, আর 'বাদানাহ' সাতজনের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে। তবে শর্ত এই যে, কারো হিসসা যেন সাতভাগের একভাগের চেয়ে কম না হয়।

নফল হাদী এবং ক্বিরান ও তামাত্তু-এর হাদী দশ তারিখের রামী করার পর থেকে বার তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত যবেহ করা যাবে। এছাড়া অন্যান্য হাদীর জন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই।

যে কোন হাদী হারামের এলাকায় যবেহ করতে হবে, তবে নহরের দিনগুলোতে মিনায় যবেহ করা হলো উত্তম।

নফল হাদী এবং ক্বিরান ও তামাত্তু-এর হাদী হলে ঐ গোশত খাওয়া হাদীওয়ালার জন্য সুন্নাত এবং যে কোন ধনী বা গরীবের জন্য তা খাওয়া জায়েয।

হাদী যদি পথেই মরণাপন্ন হয়ে পড়ে এবং পথেই যবেহ করা হয় তাহলে হাদীওয়ালা নিজে এবং কোন ধনী ব্যক্তি তা খেতে পারবে না, বরং যবেহ করার পর চিহ্ন দিয়ে সেখানেই সেটাকে ফেলে রাখবে।

নযরকৃত হাদীর গোশত খাওয়া হাদীওয়ালার জন্য যেমন জায়েয নয়, তেমনি কোন ধনী ব্যক্তির জন্যও জায়েয নয়। কেননা ছাদাকা হিসাবে সেটা হচ্ছে গরীবদের হক। জিনায়াতের হাদী সম্পর্কেও একই কথা।

নবীজীর যিয়ারত

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ له شَفَاعَتِي

যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে। (তাবারানী)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন–

مَن حجَّ البيتَ و لم يَزُرنِي فقد جَفَانِي

যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর হজ্জ তো করেছে, কিন্তু আমার যিয়ারত করে নি সে আমার উপর অবিচার করেছে (তাবারানী)

সুতরাং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারত করা সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা যাকে হজ্জ করার তাওফীক দান করেন তার কর্তব্য হলো হজ্জের পরে বা আগে মদীনা শরীফে হাযির হয়ে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারত করা এবং সেই সঙ্গে মসজিদে নববীরও যিয়ারতের নিয়ত করা। কেননা, সেখানের নামায ও ইবাদতের ছাওয়াব হাজার গুণ।

মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর বেশী বেশী দুরূদ পড়তে থাকো।

মদীনা শরীফে পৌঁছার পর সামানপত্রের ব্যবস্থা করে প্রথমে গোসল করো, খোশবু ব্যবহার করো এবং তোমার উত্তম লেবাসগুলো পরিধান করো, যাতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হওয়ার গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ পায়।

তারপর অত্যন্ত বিনয়, প্রশান্তি ও ভাবগম্ভীরতার সঙ্গে প্রথমে মসজিদে নববী শরীফে প্রবেশ করো এবং দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করো এবং মনের সাধ মিটিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ-মুনাজাত করো।

এবার ধীর পদক্ষেপে কবর শরীফের দিকে অগ্রসর হও এবং পূর্ণ আদব রক্ষা করে, হৃদয়ে ভক্তি-ভালোবাসার ভাব নিয়ে কবর শরীফের সামনে দাঁড়াও এবং প্রথমে নিজের পক্ষ হতে ছালাত ও সালাম পেশ করো, তারপর যারা ছালাত ও সালাম পেশ করার অছিয়ত করেছে তাদের পক্ষ হতে ছালাত ও সালাম পেশ করো।

ছালাত ও সালাম পেশ করার পর আবার মসজিদে ফিরে আসো এবং যত ইচ্ছা নফল নামায পড়ো, আর নিজের জন্য, মা-বাবার জন্য এবং যারা অছিয়ত করেছে তাদের জন্য যত পারো আল্লাহর কাছে দু'আ-মুনাজাত করো।

যত দিন মদীনা শরীফে অবস্থান করবে সেটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে যিকির-তিলাওয়াতে এবং রাত্রি জাগরণে মশগুল থাকো, আর যখনই সম্ভব হয় প্রিয় নবীর যিয়ারতে যাও এবং বেশী বেশী তাসবীহ, তাহলীল ও তাওবা-ইস্তিগফার করো।

'জান্নাতুল বাকী' হলো মদীনা শরীফের কবরস্তান। এখানে নবী-কন্যা মা ফাতেমা, উম্মাহাতুল মুমিনীন, ছাহাবা কেরাম, তাবেঈন এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের কবর রয়েছে। মদীনা শরীফে অবস্থানকালে মাঝে মাঝে জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তাঁদের কবর যিয়ারত করো।

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যত দিন মদীনা শরীফে থাকার তাওফীক দান করবেন, প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায মসজিদে নববীতে পড়ার চেষ্টা করবে।

যখন মদীনা শরীফ থেকে বিদায়ের সময় হবে তখন মসজিদে নববীতে গিয়ে দু'রাক'আত নামায পড়ার মাধ্যমে মসজিদে নববীকে বিদায় জানাও এবং দু'আ-মুনাজাত করে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর শরীফের সামনে গিয়ে দাঁড়াও এবং আদবের সঙ্গে ছালাত ও সালাম পেশ করো, তারপর নবীজীর বিরহের শোকে কেঁদে কেঁদে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে ফিরে আসো এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করো যেন বারবার নবীজীর যিয়ারত নছীব হয়।

কোরবানীর বয়ান

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

কোরবানীর দিন আদমের বেটা যত আমলই করে তার মধ্যে কোরবানীর আমলই আল্লাহর কাছে সবচে' প্রিয় আমল। আর কেয়ামতের দিন (পুরস্কার লাভ করার জন্য) সে কোরবানীর পশুর শিং, পশম ও ক্ষুর নিয়ে (আল্লাহর সামনে) হাযির হবে। আর কোরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা খুশি মনে কোরবানী করো। (তিরমিযি, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে)

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছে –

مَنْ كَانَ لَه سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

সচ্ছলতা সত্ত্বেও যে কোরবানী করবে না সে যেন আমাদের ঈদগাহের কাছেও না আসে। (ইবনে মাজাহ, হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে)

أُضْحِيَة মানে কোরবানীর যবেহ করার পশু। শরীয়তের পরিভাষায়– أضحية হলো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পশুকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে কোরবানী করা।

ছাহেবায়নের মতে কোরবানী করা সুন্নতে মুআক্কাদাহ, আর আবু হানীফা (রহ) এর মতে তা ওয়াজিব, এবং এর উপরই ফতোয়া।

কারো উপর কোরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো–

মুসলমান হওয়া, স্বাধীন হওয়া, মুকীম হওয়া এবং সচ্ছল হওয়া (অর্থাৎ মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেছাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া)

সুতরাং কাফির, গোলাম, মুসাফির ও অসচ্ছল ব্যক্তির উপর কোরবানী ওয়াজিব নয়।

আর কোরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য নেছাবের বর্ষপূর্তি আবশ্যক নয়, বরং কোরবানীর দিন নেছাবের মালিক হওয়াই যথেষ্ট।

যিলহজ্জের দশ তারিখে ফজর উদয় হওয়ার সময় থেকে ১২ তারিখের সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত হলো কোরবানীর সময়।

তবে শহরে এবং বড় গ্রামে ঈদের নামাযের আগে কোরবানীর পশু যবেহ করা জায়েয নয়।

সর্বোত্তম হলো প্রথম দিন কোরবানী করা, তারপর দ্বিতীয় দিন, তারপর তৃতীয় দিন।

ভালোভাবে যবেহ করতে পারলে নিজের হাতে কোরবানী করাই উত্তম।[১] না পারলে অন্যের হাতে যবেহ করা যায়,তবে যবেহর সময় নিজে উপস্থিত থাকা উচিত।

দিনে কোরবানী করা উত্তম, আর রাত্রে কোরবানী করা মাকরূহ।

কোন কারণে যদি প্রথম দিন ঈদের জামা'আত না হয় তাহলে যাওয়ালের পর কোরবানী করা জায়েয হবে।

কোন শহরে যদি ঈদের একাধিক জামা'আত হয় তাহলে ঐ শহরের প্রথম জামা'আতের পরই কোরবানী করা যাবে।

কোরবানীর পশু কেমন হবে?

উট, গরু, মোষ ও মেষ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা কোরবানী ছহী হবে না। কোন বন্যপশু দ্বারা কোরবানী ছহী হবে না।

একটি মেষ দ্বারা শুধু একজনের কোরবানী হবে।

উট, গরু ও মোষ দ্বারা সাতজনের কোরবানী হয়, তবে শর্ত এই যে, কারো হিসসা যেন সাতভাগের একভাগের কম না হয়।

কারো হিস্‌সা যদি সাতভাগের একভাগের কম হয় তাহলে অন্যান্য শরীকের কারো কোরবানীই ছহী হবে না।

আর একটি উট, গরু ও মোষ সাতজনের জন্য যথেষ্ট হবে যদি

---

১. وَ الأَفْضَلُ أن يَذْبَحَ أُضْحِيَتَه بِنَفْسِه إن كانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ

প্রত্যেকের উদ্দেশ্য কোরবানী হয়। যদি একজনেরও উদ্দেশ্য হয় শুধু গোশত খাওয়া তাহলে কারো কোরবানীই ছহী হবে না।

এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছর শুরু হওয়া মেষ কোরবানির জন্য গ্রহণযোগ্য, তবে ছয়মাসের বেশী বয়সী মেষ-শাবককে যদি হৃষ্ট-পুষ্টতার কারণে এক বছর বয়সী মনে হয় তাহলে তা দ্বারাও কোরবানী ছহী হবে।

গরু ও মোষের ক্ষেত্রে শর্ত হলো দু'বছর পার হয়ে তৃতীয় বছর শুরু হওয়া, আর উটের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পার হয়ে ষষ্ঠ বছর শুরু হওয়া।

কোরবানীর পশু যাবতীয় খুঁত ও ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া উত্তম।

কোরবানী জায়েয হবে না–

১ – শিং একেবারে গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেলে

২ – অন্ধ বা কানা হলে

৩ – যবেহখানা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না এমন পঙ্গু হলে (খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হলেও যদি হেঁটে যেতে পারে তাহলে জায়েয হবে।)

৪ – কান বা লেজ পুরো বা বেশীর ভাগ কাটা হলে

৫ – একেবারে শীর্ণ ও মাংসহীন হলে

৬ – অধিকাংশ দাঁত ভেঙ্গে পড়ে গেলে

৭ – জন্মগতভাবে কান না থাকলে (জন্মগতভাবেই শিং নেই, কিংবা আংশিক ভেঙ্গে গেছে, এমন পশুর কোরবানী করা জায়েয আছে।)

খুজলি–আক্রান্ত পশু হৃষ্ট-পুষ্ট হলে কোরবানী জায়েয হবে, নতুবা জায়েয হবে না।

পশুটি যদি তিন পায়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হলেও হেঁটে যেতে পারে তাহলে কোরবানী জায়েয হবে।

গোশত ও চামড়ার ব্যবহার

কোরবানীর গোশত নিজেও খেতে পারে এবং গরীব ধনী সবাইকে দিতে পারে। তবে উত্তম নিয়ম হলো তিনভাগ করে একভাগ গরীবদের মাঝে ছাদাকা করা, একভাগ নিজের ও পরিবারের জন্য রাখা এবং

একভাগ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে বিতরণ করা। (সামান্য কিছু রেখে) সব গোশত ছাদাকা করে দেয়া আরো ভালো, তবে সব গোশত নিজের ও পরিবারের জন্য রেখে দেয়াও জায়েয আছে।

কোরবানীর পশুর চামড়া নিজে ব্যবহার করা বা কোন ধনীকে হাদীয়া করা জায়েয, তবে বিক্রী করলে তার মূল্য ছাদাকা করা আবশ্যক।

কোরবানীর গোশত বা চামড়া দ্বারা কসাইয়ের মজুরি পরিশোধ করা জায়েয নয়।

কয়েকটি মাসআলা

১ – যদি নযর বা মান্নতের কোরবানী হয়, যেমন বললো যে, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে একটি কোরবানী করার মান্নত করলাম, কিংবা আমার অমুক কাজটি হলে একটি কোরবানী করবো তাহলে ঐ কোরবানীর গোশত নিজে ব্যবহার করতে পারবে না, বরং সমস্ত গোশত ও চামড়া গরীবদের মাঝে ছাদাকা করা ওয়াজিব হবে।

২ – যদি কর্মচারীকে খানা খাওয়ানোর শর্ত থাকে তাহলে কোরবানীর গোশত তাকে দেয়া যাবে না। সঙ্গে যদি অন্য তরকারী থাকে, আর গোশত হাদিয়া হিসাবে দেয় তাহলে জায়েয হবে।

প্রশ্নমালা

১ – কোরবানীর ফযীলত সম্পর্কে কী জানো বলো।

২ – কোরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্ত কী কী?

৩ – যাকাত, ছাদাকাতুল ফিতর ও কোরবানীর জন্য নেছাবের মালিক হওয়া আবশ্যক, কিন্তু পার্থক্য কী?

৪ – কোরবানীর সময় সম্পর্কে যা জানো বলো।

৫ – তোমার কোরবানীর পশু, কে যবেহ করবে?

৬ – কী কী ধরনের পশু কোরবানী করা জায়েয নেই?

৭ – কোরবানীর গোশত ও চামড়া ব্যবহারের বিধান কী?

সমাপ্ত